সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

বকেয়া মহার্ঘতার দাবিতে ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

সাধারণ ধর্মঘট

সফল করুন

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১ ■ ৪৯তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

দ্বিতীয় রাজ্য মহিলা কনভেনশন

সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান

উদ্বোধক রত্না দত্ত

২৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় মহিলা প্রতিনিধিদের এক বর্ণাঢ্য, স্লোগানমুখর সুসজ্জিত মিছিলের মধ্য দিয়ে শুরু হল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আহূত দ্বিতীয় রাজ্য মহিলা কনভেনশন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবন থেকে শুরু হয়ে এই মিছিল সংলগ্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে। মিছিলে মহিলা নেতৃত্ব, মহিলা

প্রস্তাব উত্থাপনে বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

প্রতিনিধিরা ছাড়াও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিন্‌হা, যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, সহ সম্পাদক দেবব্রত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনের উদ্বোধক শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী রত্না দত্তও উদ্বোধনী মিছিলে পা মেলান।

উদ্বোধনী বর্ণাঢ্য মিছিল

বেলা ১১টায় শুরু হয় উদ্বোধনী অধিবেশন। কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে, নার্সিং কর্মচারীদের সংগঠন গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর প্রয়াত কমরেড বকুল মজুমদার নামাঙ্কিত মঞ্চে কনভেনশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে সি আই টি ইউ-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং আই সি ডি এস প্রকল্প কর্মীদের অগ্রনী সংগঠক রত্না দত্ত একাধিক উদাহরণ সহকারে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের উপসর্গ হিসেবে লিঙ্গ বৈষম্যের বিভিন্ন

প্রতিবেদন পেশ করছেন সুতপা হাজরা

দিক তুলে ধরেন। অসংগঠিত ক্ষেত্রের নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য, সংগঠিত ক্ষেত্রেও পুরুষতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে নারী শ্রমিক কর্মচারীদের কাজ করতে বাধ্য হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলিও তাঁর বক্তব্যে উত্থাপিত হয়। নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের সাফল্য, কেরালায় বর্তমান বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সাফল্যের দিকগুলিও তাঁর বক্তব্যে স্থান পায়। সর্বোপরি আই

উদ্বোধককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

সি ডি এস আশা, অঙ্গনওয়ারি প্রমুখ প্রকল্পে যুক্ত নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের ব্যর্থতার খতিয়ান উল্লিখিত হয়।

জবাবী বক্তব্য রাখছেন বিজয় শংকর সিন্‌হা

● তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ ১০৩/২১ তারিখ ঃ ২১-১২-২০২১

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

শ্রদ্ধেয় মহাশয়া,

কোভিড অতিমারির বিপদ সম্পূর্ণ দূরীভূত না হলেও, জনজীবনে স্বাভাবিক পরিস্থিতি অনেকাংশেই ফিরে এসেছে। রাজ্য প্রশাসনও শুধুমাত্র কোভিড কেন্দ্রীক পরিকল্পনায় আবদ্ধ না থেকে, বহুমাত্রিক বিভিন্ন কর্মসূচী, যা কোভিড জনিত পরিস্থিতির কারণে অনেকাংশে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পাচ্ছিল, পুনরায় রূপায়ণের অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত হচ্ছে। বলাবাহুল্য রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীরা ওপর থেকে নেমে আসা নির্দেশিকার ভিত্তিতে, এই সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করছেন।

এমতাবস্থায়, কর্মচারীদের জরুরি দাবিগুলির সুষ্ঠ মীমাংসা ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনে বর্ধিত উৎসাহ প্রদান করতে পারে। বিপরীতে ন্যায্য ও জরুরি দাবিগুলি সম্পর্কে সরকারের দীর্ঘ নীরবতা প্রশাসনের অভ্যন্তরেই একধরনের নিরুৎসাহের পরিবেশ তৈরি করে, যা কর্মচারীদের ভূমিকায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, কর্মচারী স্বার্থের সাপেক্ষে জরুরি দাবিগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মহার্ঘভাতার দাবি, যার বকেয়ার পরিমাণ ২৮ শতাংশে পৌঁছেছে। পেট্রোপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির সময়ে, বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকার অর্থ কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং এক ধরনের আর্থিক বিপন্নতা সৃষ্টি করে।

স্বভাবতই নিরুৎসাহ ও বিপন্নতার যৌথ নেতিবাচক প্রভাব থেকে রাজ্য কর্মচারীদের রক্ষা করার দায়িত্ব, প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে আপনি গ্রহণ করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এই বিষয়ে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয়শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে

জাতীয় কর্মশালা

গত ১১-১২ ডিসেম্বর, ২০১১ কর্ণাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরু শহরে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হল, পেনশন বেসরকারীকরণ ও অনিয়মিত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত জাতীয়

বক্তব্য রাখছেন এ. শ্রীকুমার

কর্মশালা। বেঙ্গালুরুর ওয়াই এম সি এ হলে দু'দিন ব্যাপী এই কর্মশালার আয়োজন করে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন অখিল কর্ণাটক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন। ১১ ডিসেম্বর এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কর্ণাটক বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী বাসবরাজ এস হোরাট্টি।

দু'দিন ব্যাপী কর্মশালার প্রথম দিনের (১১ ডিসেম্বর) বিষয় ছিল পেনশন বেসরকারীকরণ। এই বিষয়ে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার। তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে শ্রীকুমার বলেন, পূর্বতন পেনশন ব্যবস্থায় কর্মচারীদের প্রাপ্য পেনশন ছিল সুনির্দিষ্ট। কিন্তু নয়া পেনশন প্রকল্পে কর্মচারীদের প্রদেয় অংশটি (বেতনের ১০ শতাংশ) সুনির্দিষ্ট হলেও, প্রাপ্য পেনশনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তিনি বলেন, পুরোনো পেনশন পদ্ধতির সাথে যুক্ত ছিল সাধারণ ভবিষ্যনিধি বা জিপিএফ। এই তহবিলের সঞ্চিত নিজস্ব অর্থ কর্মচারীরা তাঁদের আপাৎকালীন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারতেন বা যারা এখনও ঐ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা পারেন। কিন্তু নয়া পেনশন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত যে তহবিলে কর্মচারীদের প্রদেয় অংশ সঞ্চিত হয়, সেখান আপাৎকালীন প্রয়োজনেও অর্থ তোলা যায় না। ১৮৫৭ সালে সীমিত পরিসরে হলেও আমাদের দেশে পেনশন ব্যবস্থা চালু হয়। স্বাধীনতার পর কেন্দ্র ও প্রাদেশিক কর্মচারীদের জন্য বিধিবদ্ধ পেনশন ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য নয়া পেনশন প্রকল্প চালু করা হয়। শ্রীকুমার আরও বলেন, রাষ্ট্র যখন জনল্যাণকামী ভূমিকা পালন করত তখন সরকারী কর্মচারীদের জন্য বিধিবদ্ধ পেনশন চালু ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র যখন নয়া

● তৃতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

সম্পাদকীয়

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন গণআন্দোলনের নতুন পাঠ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল থেকে মুক্তি পেয়ে ভারত নামক যে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রটি ভূমিষ্ট হয়েছিল, আজ তা ৭৫ বছরে পদার্পণ করেছে। ৭৫ বছর আগে এই রাষ্ট্রের জন্মদাতা সংবিধান, যে সমস্ত গুণাবলী নিয়ে শিশু রাষ্ট্রটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠবে বলে ঘোষণা করেছিল, তার সবটার ঠিক ঠিক বিকাশ না ঘটলেও, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে, স্বাধীন চিন্তার ভিত্তিতে নিজস্ব করণীয়গুলি নির্ধারণ করে এগনোর মতো শক্তি কিছুটা হলেও অর্জিত হয়েছিল। নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি (ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি) বজায় রাখার প্রশ্নেও, অভিভাবকদের খামখেয়ালিপনায় কখনও কখনও দুর্বলতা দেখা গেলেও সাধারণভাবে সঠিক পথটাই ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সদ্যোজাত শিশু রাষ্ট্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু করার আগেই, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি একটা প্রবল ধাক্কা খেয়েছিল। যেদিন আচরণে সন্ত্রাসবাদী এক স্ব-ঘোষিত 'হিন্দু'-র গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন, আচরণে নিষ্ঠাবান হিন্দু, কিন্তু চিন্তায় সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ মহাত্মা গান্ধী। আবার এই শোক ও যন্ত্রণার পর্ব পেরিয়ে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটি হয়ে উঠল এক গর্বের দিন, যেদিন সংবিধানের নির্দেশক্রমে গুটি গুটি পায়ে এগোতে শুরু করল সদ্যজাত রাষ্ট্রটি।

একটু পিছনের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখব, প্রাণঘাতী এক ধর্মীয় জিঘাংসার পরিবেশে শিশু রাষ্ট্রটি ভূমিষ্ট হওয়ার অব্যবহিত পরেই গান্ধীজীকে হত্যার করার মধ্য দিয়ে ধর্মোন্মাদনাকেই রাষ্ট্রের চরিত্রে প্রোথিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সংবিধান সেই প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেয়। ধর্মীয় উন্মাদনার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে বর্জন করে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রগতিশীল ভাবনাকে আত্মস্থ করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। এইভাবেই ৩০ জানুয়ারি এবং ২৬ জানুয়ারি দুটি দিনই স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যথাক্রমে 'কালো দিন' ও 'সোনালী দিন' হিসেবে।

স্বাভাবিক জনচেতনার নিরিখেই ৩০ জানুয়ারি দিনটি, যেদিন এক প্রকৃত জননেতাকে হত্যা করা হয়েছিল, তা জাতীর জীবনে 'কালো দিন'। আবার ২৬ জানুয়ারি, যেদিন আধুনিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সংবিধান গৃহীত হয়েছিল, তা একই কারণে 'সোনালী দিন'। এর কোনোটিই আরোপিত বা প্রক্ষিপ্ত নয়।

অথচ বর্তমান সময়ে স্বাভাবিক জনচেতনার বিপ্রতীপ ধারণাকে ভারত ইতিহাসে আরোপ করার কাজ শুরু হয়েছে। যা জনচেতনার নিরিখে 'সোনালী দিন' হতেই পারে না (যেমন কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রদানকারী ৩৭০ ধারা বাতিল করা)। তাকেই 'সোনালী দিন' হিসেবে ভারতের প্রবহমান ইতিহাসে জোর করে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ইতিহাসের এই 'মিথ্যা' নির্মাণকে অনেক 'সত্য'-র মধ্যে শুধু গুঁজে দেওয়াই হয় না, একে জায়গা করে দেওয়ার জন্য, একটি সত্যকে জোর করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। যেমন ৩৭০ ধারা বাতিলের অনৈতিহাসিক 'গর্ব'কে ইতিহাসের পাতায় ঢোকানোর জন্য ভারতভুক্তির প্রশ্নে কাশ্মীরবাসীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে ইতিহসের পাতা থেকে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে।

প্রকৃত ইতিহাসকে দুমরে-মুচরে একটা নির্দিষ্ট 'হিন্দুত্ববাদী' পরিকল্পনার খোলসে ঢোকানোর এই অপকৌশল যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় গতি পাচ্ছে, তখনই ইতিহাসের প্রকৃত 'সোনালী অধ্যায়' রচনায় এক ঝড় উঠল দেশের বুকে। এবারে এই অধ্যায় রচনার দায়িত্ব নিলেন জনগণের অন্নদাতারা। যারা ইতিহাসের মিথ্যা নির্মাণ কল্পে নিবেদিত, তারা প্রকৃত ইতিহাস রচনার এই অসাধারণ উদ্যোগকে পদে পদে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে। ওদের তূনীরে যত ধরনের অস্ত্র ছিল, সমস্তগুলিকেই ব্যবহার করা হয়েছে স্বর্ণালী ইতিহাস রচনার এই কাজকে পর্যুদস্ত করার জন্য। সাথে প্রকৃতির করাল ভ্রূকুটি তো ছিলই। কিন্তু যাঁরা রোদ, ঝড়, বৃষ্টির সাথে লড়াই করে আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেন, তাঁরা ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রেও সেই সহজাত অনমনীয় মনোভাবের স্বাক্ষর রাখলেন।

স্বাধীনতার আগে ও পরে বহু কৃষক আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করছে আমাদের দেশের ইতিহাস। এর প্রত্যেকটিই সমকালীন পরিস্থিতির নিরিখে নিজ বৈশিষ্টে সমুজ্জ্বল। কিন্তু তিনটি কলা কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপ্তি, কৃষক সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তরের আন্তঃঐক্য, সঙ্কল্পবদ্ধতা, অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শিত হয়েছে, এক কথায় তা নজিরবিহীন। মিথ্যা প্রচার, বলপ্রয়োগ, ছলনা প্রভৃতি শাসকের প্রতিটি অস্ত্রকে ভোঁতা করে দেওয়ার যে পারদর্শিতা কৃষকরা যূথবদ্ধভাবে প্রদর্শন করেছেন তা অভাবনীয়, অভূতপূর্ব। এমনকি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আপাত মধ্যস্ততাকারী অবস্থানও তাঁদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। ন্যায়ালয়ের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করেও, ন্যায়ালয়ের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার বিষয়টি তাঁরা মেনে নেননি। এত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন শুরু থেকে একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছনো পর্যন্ত, এমনকি লক্ষ্যে পৌঁছনোর পরেও, তার গণতান্ত্রিক চরিত্রকে বজায় রেখেছে।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস অসহযোগী আন্দোলন ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বাধিক পরিপুষ্ট ধারা। ঐ আন্দোলনের সাথে সংস্রব রেখেও, সমান্তরালে অতিরিক্ত জঙ্গী ঝাঁঝ নিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্জাত বাম আন্দোলন। স্বাধীনতার পরেও খেটে খাওয়া বিভিন্ন অংশের মানুষের জীবন-জীবিকা কেন্দ্রীক, সংবিধান স্বীকৃতি শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের ধারা প্রবহমান রয়েছে এবং চলার পথে বহু 'মাইলস্টোন' স্থাপনও করেছে। বর্তমান পর্বের কৃষক আন্দোলন শুধুমাত্র প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর গণআন্দোলনের পরম্পরাকে বহন করল তা নয়। এমন এক সময় সেই পরম্পরার জয়ধ্বজা ওড়াল, যখন সেই পরম্পরাকে, যার মৌলিক বৈশিষ্ট ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ-জাতি ভেদ নির্বিশেষে ঐক্য, তার জনকল্যাণকামী কক্ষ পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বহুমাত্রিক বিভাজনের কানাগুলিতে ঠেলে দেবার জোরদার চেষ্টা চলছে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনবিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে (যেমন 'অক্যুপাই ওয়াল স্ট্রীট', আরব বসন্ত')। কিন্তু তাকে সংগঠিত কাঠামোয় বেঁধে ফেলার আগেই অথবা বেঁধে না ফেলার জন্য, ক্ষোভের প্রবাহে বুদবুদের মতো ফুটে উঠে অচিরেই ফেটে যায়। বিজয়ী কৃষক আন্দোলন সেদিক থেকে অনন্য, কারণ এখানে স্বতঃস্ফূর্ততার শরীরে এমন এক ঢিলেঢালা সাংগঠনিক পোশাক পরানো হয়েছে, যাতে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে ধারণও করা যায়, আবার তাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাতাসও চলাফেরা করতে পারে। এক কথায় আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ততা, সাংগঠনিক বাঁধন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভারসাম্যমূলক সমন্বয়ের ফলে তৈরি হয়েছে ইস্পাতদৃঢ় 'ডিটারমিনেশন'। এই আন্দোলন পাখির চোখে লক্ষ্য স্থির রেখেও, সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই এর পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। দিল্লীর সীমানায় তৈরি হওয়া ঢেউ যেমন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আছরে পড়ছে, টেনে এনেছে দেশের সব রাজ্যের সব অংশের কৃষককে। তেমনই এই আন্দোলনের চৌম্বক শক্তি এর কেন্দ্রে টেনে এনেছে শ্রমিক-কর্মচারী সহ অন্যান্য অংশের পেশাজীবীদেরও। শুধু নিজ আন্দোলনের বৃত্তের চারপাশে, অন্যান্য পেশাজীবীদের এনে জড়ো করেছে তাই নয়, নিজেরাও, নিজস্ব আন্দোলনের 'ইনটেনসিটি'কে এতটুকু হালকা না করেও জড়ো হয়েছে অন্যান্য আন্দোলনগুলির বৃত্তের চারপাশে। সংখ্যাগত এই প্রসারের পাশাপাশি গুণগত প্রসারও অপরিসীম তাৎপর্যবাহী। তিন কৃষি আইন বাতিল ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দাবি নিয়ে শুরু হওয়া সংগামের এজেন্ডায় যুক্ত হয়েছে অপরাপর অংশের শ্রমজীবীদের জরুরি দাবি। গুণগতভাবে প্রসারমান আন্দোলন বিদ্যমান রাজনৈতিক আবহের বিদ্বেষমূলক উপাদানগুলিকে মোকাবিলা করেছে সাহসের সাথে। কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন শাসকদলের সাথে তৈরি হওয়া দ্বন্দ্বের কষ্টিপাথরে শান দিয়েছে সমষ্টিগত চেতনাকে। তৈরি হয়েছে ফ্যাসিস্টধর্মী শক্তির চোখে চোখ রেখে কথা বলার মতো রাজনৈতিক চেতনা।

যারা পর্দার সামনে, তাদের ক্রিয়াকলাপ তো নজরে পড়েই। কিন্তু যারা পর্দার আড়ালে, যাদের হাতে ধরা সুতোর টানে নাচছে কেন্দ্রের সরকার, কৃষক আন্দোলনের সার্চ লাইট পর্দা ভেদ করে গিয়ে পড়েছে সেই দেশি-বিদেশী কর্পোরেটদের ওপরেও। পাঁচ শতাধিক সংগঠনের এই মুক্তমঞ্চের সকলেই যে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর পাঠশালায় প্রাথমিক পাঠ সাঙ্গ করে, তবেই ট্রাকটরে চেপে আন্দোলন স্থলে পৌঁছেছিলেন তা নয়। কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ সংগ্রামের গবেষণাগারে ব্যবহারিক পরীক্ষায় আত্মমগ্নতা ধীরে ধীরে সেই দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশ ঘটিয়েছে, যার সাহায্যে অনেকরকম বিভাজন রেখায় আঁকিবুকি কাটা সমাজ দেহে 'শ্রেণী' নাম মূল বিভাজনটিকে চিনতে অসুবিধা হয়নি।

সব ধরনের শোষণের আঁতুর ঘর শ্রেণী শোষণ—এই বিশ্লেষণকে বামেদের 'স্টিরিও টাইপ' বুলি বলে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতা পণ্ডিত মহলের একাংশের মধ্যে রয়েছে। অথচ শত্রু-মিত্র চিনতে চিনতে এগিয়ে চলা একটা আন্দোলন, পথের শেষ প্রান্তে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় একটা 'শ্রেণী'কে ঠিক খুঁজে বের করে, 'স্টিরিওটাইপ' বামবুলির যথার্থতাকে আরও একবার প্রতিষ্ঠিত করে গেল। 'আইন বাতিল না করা পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরব না'—শুরুতে অনেকেই ভেবেছিলেন শুনতে মন্দ না হলেও, এটা কখনও সম্ভব নয়। হয়তো বা কৃষকরা জেদের বশে এমন একটা কথা বলে ফেলেছে। আন্দোলন যত এগিয়েছে, ততই মনে হয়েছে আর কতদিন? আন্দোলনরত কৃষকরা যখন একের পর এক সাথীকে হারিয়েছেন, তখন এই আন্দোলনের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল কারও কারও এমনও মনে হয়েছে, এবার বোধহয় ঘরে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু না, সমস্ত শঙ্কা, অনুমানকে ভুল প্রমাণ করে, সাতশোরও বেশি সাথীর প্রাণের বিনিময়ে জয় হাসিল করে তবেই তাঁরা ঘরে ফিরলেন।

ঘরে ফিরলেন, কিন্তু আন্দোলন থেমে গেল না। একটি কেন্দ্রীভূত আন্দোলন বিজয়ী হয়ে, বিকেন্দ্রীভূত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যে রাজ্যে, মহল্লায় মহল্লায়। কারণ কৃষি আইন বাতিল করার দাবি ছাড়াও অনেকগুলি দাবিও যে রয়েছে তাদের। যেমন ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবি। তারা জানে স্বৈরাচারী শাসক, মিথ্যাচারীও হয়। তাই আন্দোলন চলবে। এক বছর কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়াই যে আত্মিক সংঘবদ্ধতার বিকাশ ঘটিয়েছে, আপাত শারীরিক দুরত্ব সেই 'সংঘবদ্ধ' চেতনাকে এতটুকু দুর্বল যাতে না করতে পারে, এখন প্রয়োজন তার অনুশীলন।

পরাজিত শাসক হিংস্রতর চেহারা নিয়ে প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা করবেই। জাত-বর্ণ-লিঙ্গ-ধর্ম ইত্যাদি বিভাজনের পাতা ফাঁদকে সন্তর্পণে এড়িয়ে যে শ্রেণী সংহতি বোধ গড়ে উঠেছে, তাকে পুনরায় দুর্বল করার জন্য পুরোনো ব্যাধিগুলিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আবারও দগদগে ক্ষত তৈরি করার চেষ্টা হবেই। কারণ আদর্শগত দিক থেকে বর্তমান শাসক তো হরেকরকম বিভাজনের অস্ত্রেই সজ্জিত।

তবুও একথা বলা যায়, আত্মহারা উল্লাসে ভেসে যাওয়া ঠিক না হলেও, আনন্দে উদ্বেলিত হওয়াই যায়। কারণ গত তিন দশকে, নয়া উদারবাদের রথের চাকা প্রথম পিছু হটল। এর আগে বেশ কয়েকবার ধাক্কা খেয়েছে। গতি শ্লথ হয়েছে। কিন্তু পশ্চাদগমন করানো যায়নি। অন্নদাতারা সেই আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। তাই কুর্ণিশ তাদের প্রাপ্য। কিন্তু শুধুই কুর্ণিশ করে দায় সারা নয়, শিক্ষাও নিতে হবে।

ডিটারমিনেশন, কমিটমেন্ট আর অকুতোভয় মানসিকতা গড়ে তোলার পাঠ নেব আমরা। আমরা শিক্ষার্থী। শিক্ষক আমাদের অন্নদাতারা। মধ্যবিত্ত সুলভ উন্নাসিকতা এই পাঠ গ্রহণে যেন বাধা না হয়। □

১২ জানুয়ারি, ২০২২

শোকসংবাদ

রতন দাস

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা প্রবীণ কমরেড রতন দাস (৭৯) প্রয়াত হয়েছেন। গত ৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকালে নিজ বাসভবনে হৃদরোগে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর বাড়ি যাদবপুরের জি ব্লকে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে পেনশনার্স সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর জীবনাবসানে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, কমরেড দাসের প্রয়াণে আমরা হারালাম একজন দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান ও প্রতিবাদ এক সহযোদ্ধাকে। তাঁর পরিবার পরিজন ও অনুগামী সমাজকে জানাই সমবেদনা।

এদিন বাসভবনে গিয়ে প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির পক্ষে ভানুদেব চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্মচারী সমিতির সাধারণ মস্পাদক অশোক প্রামাণিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা খোকন ঘোষ দস্তিদার, কানাই দেব প্রমুখ। কমরেড দাসের স্ত্রী ও দুই কন্যার বর্তমান। □

বকুল মজুমদার

রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেত্রী, ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্ব, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড বকুল মজুমদার গত ২৭ অক্টোবর, ২০২১ ভোরবেলায় দক্ষিণ কলকাতার শ্রীকলোনী অঞ্চলে অবস্থিত নিজবাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মাস তিনেক আগে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পান এবং হাসপাতালে ভর্তিও হয়েছিলেন। কোনো ফ্র্যাকচার না হলেও বয়সজনিত কারণে আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে ২৭ অক্টোবর কমরেডের জীবনাবসান ঘটে।

১৯৩৯ সালে আগস্ট মাসে ময়মনসিংহ জেলার একটি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। খুব কম বয়সে পরিবারের সাথে এদেশে চলে আসেন। প্রথমে পাথুরিয়াঘাটা পরবর্তীতে হিন্দমোটরে স্থায়ী ঠিকানা হয়।

১৯৫৯ সালে গ্রেড-IV নার্স হিসেবে তিনি প্রথম নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজে যোগ দেন। তিনি ১৯৬০ সালে অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার বেড়াচাঁপা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বদলী হয়ে আসেন। ১৯৬৩ সালে তিনি এম. আর. বাঙ্গুর হাসপাতালে এ. এন. এম. ট্রেনিং নিতে আসেন এবং ট্রেনিং শেষে ১৯৬৫ সালে মালদা জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে বিভিন্ন দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে সারারাত্রি ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচীতে কমরেড অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে বদলী হয়ে আসেন অতিরিক্ত ২৪ পরগনা জেলায় এবং এম. আর. বাঙ্গুর হাসপাতালের D.F.W.O-র Operation Team সাথে যুক্ত হন। এই টীমে থাকার সুবাদে কমরেডের বিভিন্ন হাসপাতালে যাওয়ার এবং কাজের শেষে নার্সিং কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করার, সংগঠিত করার কাজ করতেন। তৎকালীন সরকারের আমলারা যখন জানতে পারেন কমরেড মজুমদার নার্সিং কর্মচারীদের সংগঠিত করছেন, তৎক্ষণাৎ ওই টিম থেকে সরিয়ে দেন।

১৯৭৮ সালে অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে তিনি জেলা সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। তিনি কর্মচারীদের সাথে খুব সহজেই মিশতে পারতেন। ১৯৮৬ সালের পরবর্তীতে তিনি কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে বদলী হয়ে আসেন এবং অবসরের দিন পর্যন্ত এখানেই কাজ করেছেন। তিনি ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতির সদস্য ছিলেন। যতদিন শারীরিক ভাবে সক্ষম ছিলেন, ততদিন দিনি কর্মচারীদের দাবিদাওয়া আদায়ের লড়াইয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গিয়েছেন। ১৯৯৩ সালে মালদা জেলায় ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের ১৯-২০তম রাজ্য সম্মেলন থেকে তিনি প্রথম বার এবং ২১-২২তম রাজ্য সম্মেলন পুরুলিয়া থেকে দ্বিতীয় বার সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। তার পূর্বেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্যের যুগ্ম-সম্পাদিকা এবং দীর্ঘদিন কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমৃত্যু শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল বিশ্বাস। শ্রেণী শোষণের অবসান ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যই ছিল তাঁর সংগঠন আন্দোলন পরিচালনার প্রেরণার উৎস স্থল। ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন এবং রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের বর্তমান প্রজন্মের সংগঠক কর্মী সকলের কাছেই ছিলেন প্রিয় বকুলদি।

বিজ্ঞান মনস্ক মানসিকতা নিয়ে কমরেড বকুল মজুমদার মৃত্যুর বহু পূর্বেই মরনোত্তর দেহ ও চক্ষুদানের অঙ্গীকার করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির কারণে দান করা সম্ভব হয়নি। তাঁর কর্মময় জীবন ও সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ সকলের কাছে অনুকরণীয়। □

বাম পথে চিলি

মানস কুমার বড়ুয়া

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে চিলিতে ৩৫ বছর বয়সী মধ্যবামপন্থী গ্যাব্রিয়েল বরিক জয়ী হয়েছেন। বিগত ১৯ ডিসেম্বর '২১ দ্বিতীয় রাউন্ডের নির্বাচনে তাঁর ভোট প্রাপ্তি ৫৬ শতাংশ। পরাজিত চরম দক্ষিণপন্থী প্রার্থী জোসে আন্তোনিও কাস্ট পেয়েছেন ৪৪ শতাংশ ভোট। উল্লেখ্য ১৯৯০-এ পিনোচেত একনায়কতন্ত্রের অবসানের পর এটাই প্রথম ভোট যেখানে দুটি প্রধান শাসক দল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন (আই ডি ইউ) ও সোশ্যালিস্ট পার্টি অনুপস্থিত ছিল। কারণ প্রথম রাউন্ডের ভোটে তারা প্রথম দুটি স্থানে ছিল না। দুটি দলই দক্ষিণপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী এবং নয়া উদারনীতি অনুসরণকারী। সোশ্যালিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক মতাদর্শে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে বরিকের জোট অ্যাপ্রুভ ডিগনিটি দ্বিতীয় স্থানে ছিল। কাস্ট ছিলেন প্রথম স্থানে। কিন্তু তার পরবর্তীকালের বিভিন্ন সমীক্ষায় এগিয়ে ছিলেন বরিক। বরিকের এই জয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বিগত এক দশকের নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে চিলির বিভিন্ন অংশের মানুষের প্রতিবাদ বিক্ষোভের শিখরে এই নির্বাচনী ফলাফলকে দেখতে হবে।

চিলি লাতিন আমেরিকার একটি ধনী দেশ এবং ও ই সি ডি গোষ্ঠীর সদস্যও বটে। এটা নয়া উদার অর্থনীতির প্রথম পরীক্ষাগার ছিল। যা চালু করেছিলেন একনায়ক অগাস্তো পিনোচেত। যিনি একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিউনিস্ট প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দেকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। নয়া উদারনীতির অংশ হিসাবে পরিষেবাসমূহের বেসরকারীকরণ, সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি থেকে রাষ্ট্রের হাত তুলে নেওয়া ইত্যাদি চিলির শাসকশ্রেণীর হাত শক্ত করেছিল। সাধারণ মানুষ তাদের অধিকাংশ চাহিদা পূরণের জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যা তাদের আরও দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়। পেনশন, বেসরকারীকরণ এবং বেতন সঙ্কোচনের চাপে তারা ঋণগ্রস্ত হতে বাধ্য হয়।

চিলির অর্থনীতি মূলত দাঁড়িয়ে আছে তামা ও অন্যান্য খনিজ রপ্তানির উপর। আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলির মূল্যবৃদ্ধি হলে অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। আবার মূল্যহ্রাস হলে উল্টোটা হয়। কিন্তু অর্থনীতি চাঙ্গা হলেও সমাজের নিচের স্তরে, বিশেষত শ্রমজীবীদের কাছে তার কোনো সুযোগ চুঁইয়ে পড়ে না। আয়ের অসাম্য রয়েছে দৃষ্টিকটুভাবে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রভাবে ঘটছে মূল্যবৃদ্ধি, বেতন ও পেনশন সঙ্কোচন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। একটা করুণ উদাহরণ হল ২০১৮ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রায় ১০০০০ মানুষ মারা যান অপারেশন ও অন্যান্য সরকারী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে না পারার কারণে। ল্যানসেট-এর তথ্য বলছে যে চিলিতে দরিদ্র অংশের একজন মহিলা, একজন ধনী অংশের মহিলার তুলনায় গড়ে ১৮ বছর কম বাঁচে।

চিলির জনগণের প্রথম বড় সংগ্রাম ছিল স্বৈরশাসক পিনোচেতকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা। কিন্তু এর দ্বারা সাধারণ মানুষের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। জনগণের সেই সংগ্রামের ফল হিসাবে চিলিতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু হয়। কনজারবেটিভ (আই ডি ইউ) এবং সোশ্যালিস্ট (সোশ্যাল ডেমোক্রাটস)-এর

মধ্যে। দু'দলেরই অর্থনীতি ছিল নয়া উদারনীতিকেই অনুসরণকারী। সোশ্যালিস্টরা যেহেতু কনজারভেটিভদের থেকে নিজেদের নীতিকে পৃথক করতে ব্যর্থ, সেহেতু তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়। এর ফলে জনগণ নির্বাচন সম্পর্কে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। পিনোচেত ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পরে পরে ঘটা নির্বাচনগুলিতে ৯০ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে। কিন্তু ২০১৭ সালে, পিনোচেত জমানার অবসানের প্রায় ৩০ বছর পর, নির্বাচনে ভোট দিয়েছে মাত্র ৪০ শতাংশ মানুষ। জনগণের প্রায় ৮০ শতাংশ শাসক শ্রেণীর দুটি রাজনৈতিক দলকে আর বিশ্বাস করছে না।

আলেন্দে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে চিলির কমিউনিস্ট পার্টির উপর পিনোচেত বাহিনী নির্মম আক্রমণ নামিয়ে আনে। হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়। ১৯৯০-এর দশক থেকে ধীরে ধীরে কমিউনিস্টরা সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়াগুলিকে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বিগত এক দশকে চিলিতে যে উদারনীতি বিরোধী আন্দোলন চলেছে কমিউনিস্টরা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে তাদের সক্রিয়তা ছিল। ২০০৭ সালে খনি শ্রমিকদের তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মঘটের নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্টরা। তারা খনি শিল্প এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র কোডেলকো (ন্যাশনাল কপার করপোরেশন অব চিলি)-র অস্থায়ী কর্মচারীদের সংগঠিত করে প্রতিবাদ সংগ্রাম পরিচালিত করে। আন্দোলনের চাপে সরকার তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়। কমিউনিস্টরা তৈরি করে কপার ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (সি টি এফ)। এই ইউনিয়নের মাধ্যমে অসংগঠিত শ্রমিকরা তাদের চুক্তিকে সমৃদ্ধ করা, মজুরী বৃদ্ধি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়। ৯০০০০-এর বেশি শ্রমিক-এর দ্বারা উপকৃত হয়। এই আন্দোলনের সাফল্য চিলির বুকে কমিউনিস্টদের সংগ্রামের জমি নতুন ভাবে তৈরি করে।

২০১১ থেকে সরকারী ব্যাপক ফিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন চিলির নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের আর একটি মাইলফলক। "অকুপাই ক্যাম্পাস" আন্দোলন বিভিন্ন ক্যাম্পাসে চালু করে ছাত্ররা। "অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট" আন্দোলন সহ সেই সময়কার এই ধরনের বিভিন্ন আন্দোলন থেকে তারা অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিল। চিলির ছাত্রসমাজ ফিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে দাবির সাথে সাথে নয়া উদারনীতির হাত ধরে আসা শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও পণ্যায়নের বিরুদ্ধে দাবিকেও যুক্ত করল। তাদের দাবি বিনামূল্যে, গুণমান সম্পন্ন, সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। ব্যাপক রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন নেমে আসে তাদের উপর। ছাত্রদের এই আন্দোলন চিলির সমাজ রাজনৈতিক পরিসরমণ্ডলে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। বলা যায় পিনোচেত জমানার পর চিলির বুকে এটাই ছিল প্রথম সুসংহত আন্দোলন।

বিগত এক দশক ধরে সমাজের নানা অংশের মানুষ নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। এই সময়কালে নয়া পেনশননীতির বিরোধিতায় ২০০০০ পেনশনার্স মিছিল করে চিলির রাজধানীর পথে।

এই ধরনের নানা প্রতিবাদ আন্দোলনকে বামপন্থীরাই একসূত্রে বাঁধার কাজটি করে। এর সাথে অসাম্যর প্রশ্ন, নয়া উদারনীতিকেও আলোচনায় হাজির করে, শুধু তাই নয়, আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজনকেও সামনে নিয়ে আসে।

বরিকের দল ফ্রেন্টা অ্যাম্প্লিও (এফ এ) অন্যান্য বেশ কিছু সংগঠনের মতো ছাত্র আন্দোলন থেকেই জন্ম নিয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র নেতা কামিলা ভালেজোও এই আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বরিকের সাথেই, ২০১৩ সালে। ২০১৭ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বরিকের দল এফ এ ২০ শতাংশ ভোট পেয়ে নতুন বাম দল হিসেবে উঠে আসে।

শ্রমিক শ্রেণীও পিছিয়ে ছিল না। তারা নয়া উদারনীতির বিভিন্ন কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশাপাশি পিনোচেত জমানার সংবিধান পুনর্লিখনের জন্য কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠনের দাবি করে। ২০১৮ থেকে এই আন্দোলন চলে। এমনকি কোভিড অতিমারিও তা দমাতে পারেনি। ধারাবাহিক জঙ্গী সংগ্রামের ফলস্বরূপ কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নির্বাচিত হয়, যেখানে দক্ষিণপন্থীরা এক তৃতীয়াংশ আসনেও জিততে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টি এফ এ এবং অন্যান্য স্বাধীন সংগঠন এখানে অধিকাংশ আসন দখল করে। এই সময় পর্বে বেশক'টি মিউনিসিপ্যালিটিতে মেয়র নির্বাচিত হন বামপন্থীরা। এইসব বিষয়গুলি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বরিকের জয় নিশ্চিত করেছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বামপন্থীদের প্রার্থী নির্বাচনের সময় এফ এ-র বরিক কমিউনিস্ট প্রার্থী ডানিয়েল জ্যাজিউকে পরাজিত করেন।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

দ্বিতীয় রাজ্য মহিলা কনভেনশন

উদ্বোধককে পুষ্প স্তবক ও বই উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানান সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিন্‌হা। সংগঠনের কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির পক্ষে প্রতিবেদন উত্থাপন করেন আহ্বায়িকা সুতপা হাজরা। এই দিন মোট ৩২ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। দু-দিন ব্যাপী কনভেনশন শেষ হবে ২৮ নভেম্বর। রাজ্য কনভেনশন উপলক্ষে একটি প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের আয়োজন করা হয়েছে।

মহিলা কনভেনশনের দ্বিতীয় দিনে প্রতিনিধিদের আলোচনা শেষ হয়েছে। মোট ৪৫ জন প্রতিনিধি সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় ধরে আলোচনা করেছে। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ২৩টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় অংশ নেন। আসন্ন ফেব্রুয়ারি মাসে দু-দিন ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী সহ সব অংশের মানুষের স্বার্থবিরোধী নীতিগুলির তীব্র সমালোচনা করেন।

আসন্ন ধর্মঘটে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরও ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণের আবেদন জানান এবং ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচারে মহিলা কর্মচারীদের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। প্রতিনিধিদের আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিন্‌হা। তিনি গোটা বিশ্বজুড়েই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীদের প্রতি যে বৈষম্য, তার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশে নারীদের অধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হলেও তার বাস্তবায়নে দুর্বলতা থেকে যায়। নয়া উদারবাদ নারীদের প্রতি এই বৈষম্যকে আরো তীব্রতর করেছে। আমাদের দেশের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন, যে সমাজ জীবনে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হওয়ার ফলে পরিবারের অভ্যন্তরে নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন না। পাশাপাশি পুঁজিবাদ নারীদেরকে ঘরের বাইরে আসার সুযোগ করে দিলেও শিক্ষাক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হন। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি পরিচালিত বিশ্বায়ন নারীদের পণ্যায়নের প্রক্রিয়াকে নিজেদের মুনাফার স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি মনুসংহিতার নির্দেশ অনুযায়ী সমাজে নারীদের অবস্থানকে নির্ধারণ করছে। পশ্চিমবঙ্গেও বর্তমান সময়ে নারীদের ওপর আক্রমণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইসব কিছুর বিরুদ্ধে যে লড়াই গড়ে তোলার দরকার তার কখনোই সফল হতে পারে না নারীদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে। তাই এই কনভেনশনের দায়িত্ব হল আগামী দিনে সংগ্রাম-আন্দোলনে মহিলাদের বর্ধিত সংখ্যায় অংশগ্রহণ করানোর উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রথম দিনের উত্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কনভেনশন উপলক্ষে যে প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিল সেখান থেকে প্রতিনিধিরা প্রায় ১৫ হাজার টাকার বই ক্রয় করেন। গীতা দে, দেবলা মুখার্জী ও শাশ্বতী মজুমদারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করেন। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

জাতীয় কর্মশালা

উদারবাদী পথ অনুসরণ করতে শুরু করে, তখন চালু হল নয়া পেনশন প্রকল্প। এমনকি এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় সুপ্রিম কোর্টের রায়েও। ১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্ট পেনশনকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু ২০০৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তা শুধুমাত্র সাংবিধানিক অধিকারে পর্যবসিত হল। সাধারণ সম্পাদকের প্রারম্ভিক বক্তব্যের পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজ্যের ১৯ জন প্রতিনিধি এই বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময় করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলোচনা করেন সুমিত ভট্টাচার্য। সমগ্র আলোচনাকে গুটিয়ে আগামী দিনে করণীয়গুলি নির্দিষ্ট করেন। সাধারণ সম্পাদক। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ অনুষ্ঠিতব্য সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের অন্যতম দাবি হল, নয়া পেনশন প্রকল্প বাতিল করার দাবি। স্বভাবতই এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আসন্ন ধর্মঘটকে সফল করার সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে আলোচনার বিষয় ছিল, অনিয়মিত / চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগের প্রসঙ্গটি। এদিন স্বাগত বক্তব্য রাখেন আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ নারায়ণন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, অন্যান্য দেশে, বিশেষত উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এর ফলে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকার ও জনগণের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়গুলি সুনির্দিষ্ট নীতির দ্বারা নির্ধারণের কাজটি সহজ হয়। তিনি আরও বলেন, ১৯৯১ সালের পর থেকে আমাদের দেশে সাধারণভাবে একটি ধারণা চালু হয়েছে যে, সরকারের ভূমিকা সঙ্কুচিত হচ্ছে। কিন্তু খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রশাসনের কেন্দ্রে বা মূলে সরকারের ভূমিকা সঙ্কুচিত হলেও পরিধিতে আরও বিস্তৃত হচ্ছে। স্থায়ী সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের দেশে প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় সরকারী কর্মচারী পদের সংখ্যা ১৩৯। আমেরিকায় এই সংখ্যা ৬৬৮, ইউরোপে ১০০০। সর্বত্রই গড়ে ৫০ শতাংশ পদ শূন্য রাখা হয়েছে। দক্ষতার অভাবের কথা বলে প্রশাসনিক উচ্চস্তরে (সিভিল সার্ভিস) ৪৭ শতাংশ পদ বিলোপ করা হয়েছে। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকার স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে ২০১৩ সালে ২০,০০০ শূন্যপদ পূরণের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, ২০১৮ সালে সেই সংখ্যা নেমে আসে ১২,০০০-এ এবং ২০২০ সালে তা আরো কমে দাঁড়ায় ১০,০০০। একদিকে সরকারী কর্মচারীরা অদক্ষ প্রচার করে কর্পোরেট ধাঁচে পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হচ্ছে। এই খাতে কোটি কোটি টাকা সরকার বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে তুলে দিচ্ছে। অপরদিকে অল্পসংখ্যক স্থায়ী কর্মচারীর ওপর বিপুল কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

এ নারায়ণন আরও বলেন, বিভিন্ন ধরনের আপতকালীন পরিস্থিতির জন্য (যেমন বর্তমান অতিমারি) প্রশাসনের কেন্দ্রকেই শক্তিশালী করা দরকার। জলবায়ুর পরিবর্তন আগামীদিনে বহু অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্ম দেবে। তাকে সামাল দেওয়ার জন্যই প্রশাসনে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক শ্রীকুমার। তিনি বলেন, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণার ওপর ভিত্তি করেই অসামরিক পরিষেবার প্রসার ঘটানো হয়েছিল। যা নয়া উদারবাদী পর্বে বিপরীত প্রবণতার শিকার। নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর ১৫টি রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলোচনা করেন অর্চিস্মান ধর। সমস্ত আলোচনা গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য রাখেন শ্রীকুমার। দু'দিন ব্যাপী কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে পাঁচজন অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা, সুমিত ভট্টাচার্য, সুতপা হাজরা, অশিস মিত্র এবং অর্চিস্মান ধর। □

মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি ও ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন

ডঃ প্রভাত পাটনায়েক

ঠিক একই দিনে, ১১ ডিসেম্বর, যেদিন ভারতীয় অর্থমন্ত্রক জোর গলায় অতিমারি উত্তরপর্বে ভারতীয় অর্থনীতির বড় মাপের পুনরুজ্জীবনের দাবি জানিয়েছিল, সেদিনই সংবাদপত্রে মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ২০২১-এর নভেম্বরে মুদ্রাস্ফীতির হার, ঠিক তার আগের বছরের নভেম্বর মাসের তুলনায় ছিল ৬.৮ শতাংশ, যা পূর্বের ৪০ বছরের যে কোনো মাসের তুলনায় বেশি। বিশেষত নভেম্বর ২০২১-এ পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল ৫৮ শতাংশ, যা ১৯৮০ সাল পরবর্তী যে কোনো মাসের মধ্যে সর্বাধিক। যদিও ভারতীয় অর্থমন্ত্রক খুশি মনে ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের অত্যাশ্চর্য দাবি জানানোর সময়, মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছিল। যদিও তারা জানত, যতদিন নয়া উদারবাদী জমানার ফাঁদে পা দেওয়া থাকবে, ততদিন এই বিষয়টি ভারতীয় অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। অতিমারির সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে গণবেরোজগারির সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তার থেকে বেরিয়ে আসার আগেই মুদ্রাস্ফীতির হারের বৃদ্ধি আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে অতিমারির সময়ে ২ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছিল, এবং তাদের একটা বড় অংশের এখনও কোনো কাজ নেই। সুতরাং মার্কিন অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধির কারণ, এতে জোগানের সীমাবদ্ধতা নয়; বরং নির্দিষ্ট কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য, যার ফলে হঠাৎই জোগানের ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ পরিসর সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্যাকে আরও বৃদ্ধি করেছে, একদিকে ফাটকা কারবার আর অন্যদিকে উৎপাদন খরচের ঊর্ধ্বগতি। এই সঙ্কীর্ণ পরিসরের সমস্যাকে অতিক্রম করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে, যার ফলে এই মুদ্রাস্ফীতি ২০২২-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত থেকে যেতে পারে। কিন্তু এই সমস্যার উদ্ভব, ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া, যা ইতোমধ্যেই সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে, তাকে আরও প্রতিকূলতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। যা আমরা গত বেশ কিছুদিন প্রত্যক্ষ করছি, ভারতীয় জনগণের ভোগের ধারাবাহিক অবনমিত স্তরের মধ্য দিয়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড (যা ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমতুল) বেশ কিছুদিন ধরেই, বাজারে অর্থ সরবরাহের মাধ্যমে বন্ড ক্রয় করার এক সহজ আর্থিক নীতি অনুসরণ করছে। একই সাথে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সুদের হারকে অত্যন্ত নিম্নহারে বেঁধে রাখা হচ্ছে। কার্যত 'শূন্য'-র কাছাকাছি। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধির সাথে সাথে এই বন্ড ক্রয় করার প্রক্রিয়া

থেকে গৃহীত পরিকল্পনার তুলনায়ও দ্রুতগতিতে সরে আসবে এবং সুদের হারও বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু মার্কিন সুদের নিম্নহারের অন্যতম ফলস্বরূপ, পুঁজি ভারতের ন্যায় দেশের দিকে, যেখানে সুদের হার বেশি, প্রবাহিত হচ্ছিল। যার ফলে সহজেই এই দেশগুলি চলতি খাতে ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারছিল, এমনকি চলতি খাতে ঘাটতি পূরণের জন্য বরাদ্দ করার পরেও বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়কে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু যদি মার্কিন সুদের হার বৃদ্ধি পায়, যা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য করতেই হবে, কারণ অন্যান্য পদ্ধতি, যেমন প্রত্যক্ষ মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রিত জোগানের প্রক্রিয়া সাধারণভাবে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি পরিহার করে চলে, তাহলে ভারতের মতো দেশ যেখানে পুরোনো সুদের হার রয়েছে, সেখানে পুঁজির প্রবাহ রুদ্ধ হবে। এমনকি এইসব দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে পুঁজির বিপরীত প্রবাহ শুরু হয়ে যেতে পারে।

যার ফলে ভারতের পক্ষে চলতি খাতে ঘাটতি মেটানো অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়বে এবং বিনিময় হারের অবমূল্যায়ন ঘটাবে। এটা ঠিকই যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়কে হ্রাস করে, বিনিময় হারকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতেই পারে; কিন্তু সঞ্চয় হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে যেহেতু 'টাকা'কে ঘিরে 'ফাটকা' শুরু হবে, তাই ঐভাবে বিনিময় হারের বৃদ্ধি কখনও সম্পূর্ণ বা স্থায়ী হতে পারে না। তাই এক কথায় মার্কিন সুদের হার বৃদ্ধি পেলে টাকার বিনিময় হারের অবমূল্যায়ন অবশ্যম্ভাবী। টাকার বিনিময় হারের প্রত্যেকবার অবমূল্যায়নের ফলে, আমদানিকৃত পণ্যের টাকায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে 'তেল'-এর ক্ষেত্রে, তখন সরকার তেল ও পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে তার বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেবে। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়বে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাবে।

এটা এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি বর্তমান সময়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে তৃতীয় বিশ্বে স্থানান্তরিত হয়। এবং এই প্রক্রিয়ার যার সাথে জড়িয়ে রয়েছে আর্থিক প্রবাহ, অতীতের তুলনায়, যখন দেশগুলি আন্তঃসীমা পুঁজির প্রবাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত, অনেক বেশি দ্রুতগতি সম্পন্ন। ঘটনা হল মার্কিন সুদের হার প্রকৃতই বৃদ্ধি পাবার আগে এবং এমনকি ভারতে চলতি খাতে ঘাটতি পূরণের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আগেই, ভারতীয় অর্থনীতিতে মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রভাব ফেলবে এটা পূর্বানুমান করেই টাকার দাম ১৬ পয়সা হ্রাস পেয়েছিল। গত কয়েক মাসের মধ্যে এটাই ছিল সর্বাধিক হ্রাস পাওয়া এবং এমন একটা সময়ে যখন নভেম্বর মাসের মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির হার ঘোষণা করা হয়েছিল।

যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজির অন্তঃপ্রবাহকে সুনিশ্চিত করে আমদানি-রপ্তানির ঘাটতি পূরণ করা, যাতে

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

ভারতের আয় বৈষম্যের কারণ হিসেবে রয়েছে যে নির্মম সত্য

সীমা চিস্তি

[সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা তৈরির উদ্যোগ না নিয়ে, বৈষম্য বৃদ্ধি করার জন্য কিছু নীতি ও পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে]

বিশ্ব বৈষম্য প্রতিবেদনের সর্বশেষ সংখ্যায় সুনিশ্চিত করা হয়েছে যে বিশ্ব অসাম্যের পথ ধরে নীচের দিকে গড়িয়ে চলেছে। "গত কয়েক দশক ধরে বর্ধিত বিশ্ব সম্পদের সিংহভাগ অংশ দখল করেছে বিশ্বের অতি ধনী গোষ্ঠী। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পুঞ্জীভূত অতিরিক্ত সম্পদের ৩৮ শতাংশ চলে গেছে ধনী শ্রেষ্ঠ এক শতাংশের হাতে। অপরদিকে নিচের দিকের ৫০ শতাংশের হাতে পৌঁছেছে এর মাত্র ২ শতাংশ।" ভারতের চিত্রটি বিশেষরকম উদ্বেগজনক। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জী এবং এস্থার ডুফলো তাঁদর ভূমিকায় বলেছেন, "ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম চূড়ান্ত অসাম্যের দেশ।" এর অর্থ হল বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে, ভারতে উপরের ১ শতাংশ ও নিচের ৫০ শতাংশের মধ্যে ফারাক সর্বাধিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্সের থেকেও ভারতের ফারাক বেশি।

দারিদ্র স্থায়ী হয়েছে

সময়ের সাথে সাথে বেড়ে চলা অসাম্যের ছবি থেকে দেখা যায় যে, "সমাজতন্ত্রের অনুপ্রেরণায় গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা" উপরের সেই ১০ শতাংশের ভাগ কমাতে সাহায্য করেছিল, যাদের হাতে ঔপনিবেশিক শাসনে আয়ের ৫০ শতাংশ গচ্ছিত ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম দু-এক দশকের মধ্যেই এই অংশ ৩৫-৪০ শতাংশে নেমে আসে। যদিও ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গৃহীত বিনিয়ন্ত্রণ ও উদারীকরণের নীতির পরিণতিতে "আয় ও সম্পদের চূড়ান্ত বৈষম্যের নিরিখে বিশ্বের অন্যতম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।" আর্থিক সংস্কার প্রক্রিয়ার ফলে উপরের ১ শতাংশ সর্বাধিক লাভবান হয়েছে। অপরদিকে নিম্ন ও মধ্য আয়ের গোষ্ঠীর মধ্যে বৃদ্ধির মাত্রা তুলনামূলকভাবে ধীর এবং দারিদ্র স্থায়ী হয়েছে।

আর্থিক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে, বিশেষত ২০১৪ উত্তরপর্বে, ভারত এমন এক পর্যায়ে কার্যত প্রবেশ করেছে, যেখানে বৃহৎ বাণিজ্য ও বেসরকারীকরণের মাধ্যমে অর্থনীতির হাল ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যার ফলে অসাম্যের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিকতম বিশ্ব অসাম্য প্রতিবেদন সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছে যে "নিচের তলার ৫০ শতাংশের অংশ ১৩ শতাংশে নেমে গেছে। ভারত কিছু সমৃদ্ধশালী অভিজাত সহ একটি দারিদ্র ও অসাম্যের দেশ।"

বৃদ্ধির হারে স্থবিরতা

এইসব কিছুর বাইরে, যা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তা হল, 'ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত অনিন্দ্য চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ, যেখানে ১৯৫১ সাল থেকে নিচের তলার ৫০ শতাংশের আয়ের ক্ষেত্রে যা ঘটছে, তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এই অংশের প্রতি বছর আয় বৃদ্ধির হার ২.২ শতাংশ। কিন্তু যা লক্ষ্যণীয় তা হল শেষ চল্লিশ বছরে বৃদ্ধির হার একদমই অপরিবর্তীত থেকে গেছে। এর থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদান নির্বিশেষে, নীচের তলার ৫০ শতাংশের অবস্থার বিশেষ কোনো হেরফের ঘটেনি। শুধুমাত্র আয় বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে তলানিতে পৌঁছেছে। এটা অকাট্য সত্য যে, নিচের তলার অংশের (অন্তত ভারতের অর্ধাংশ) অবস্থার কোনো বদল না ঘটার ফলে সৃষ্টি অসাম্য এই সময়কালে গৃহীত আর্থিক নীতি নির্বিশেষে স্থায়ী রূপ নিয়েছে। এর কারণ ভারতে বিদ্যমান সামাজিক অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা।

স্পষ্টতই, ভারতে যে সামাজিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে, তার ফলেই এই অসাম্য উৎসাহিত ও স্থায়িত্ব লাভ করেছে। ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার পরবর্তীতে অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছিল। নেহরুবাদী পর্বে এবং তারপরেও ভারতে সামাজিক গণতন্ত্রের অভাবকে ঘোচানোর একটা চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা রাজ্য ও অঞ্চলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। যার ফলে কেরালা ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে কিছুটা গতিশীলতা ও স্বচ্ছলতা লক্ষ্য করা যায়। কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশেরও কোনো কোনো অঞ্চলে নীচের তলার মানুষের জীবনকে চিরস্থায়ী দারিদ্র ও বঞ্চনার মধ্যে ফেলে রাখার জন্য দায়ি সামাজিক কাঠামোগুলোকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটেছিল আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে। সুতরাং যে সতর্কীকরণের ঘণ্টাটি আমাদের শুনতে পাওয়া দরকার তা হল, অসাম্য বৃদ্ধির জন্য দায়ি আর্থিক নীতির বাইরেও, শাসকদল রাজনীতির সাথে সরাসরি বিশ্বাসের প্রশ্নটিকে যুক্ত করেছে এবং পুরোনো সামাজিক কাঠামোগুলি থেকে বেরিয়ে আসার পরিবর্তে, এগুলিকে মদত দিচ্ছে—প্রতিদিন শক্তিশালী করছে। সামাজিক কাঠামো, আর্থিক অসাম্য ও দারিদ্র্যের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কটির মোকাবিলা করা দরকার।

সমীক্ষা এবং তথ্য

সামাজিক নিপীড়নমূলক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রতিহত না করে বিশ্বের কোথাও মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বা অসাম্য হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। ২০১৮ সালে ১০৬টি দেশকে নিয়ে করা একটি যুগান্তকারী গবেষণায়, যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা, 'ওয়ার্ল্ড ভ্যাল্যুস সার্ভে' থেকে

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

জনগণ ও দেশকে বাঁচাতে

২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট

সমগ্র দেশ ও জাতি আজ বিপন্ন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ও সরকারী পরিষেবার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন। অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থা ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পলিসি (এন এম পি)-এর সর্বশেষ আক্রমণ পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে। লোকসভায় বিজেপির নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার পরিণাম জন্ম দিয়েছে 'ইলেকট্রোরাল অটোক্রেসি' বা রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

সমগ্র দেশ ও জাতি আজ বিপন্ন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ও সরকারী পরিষেবার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন। অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থা ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পলিসি (এন এম পি)-এর সর্বশেষ আক্রমণ পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে। লোকসভায় বিজেপির নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার পরিণাম জন্ম দিয়েছে 'ইলেকট্রোরাল অটোক্রেসি' বা রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের।

ইউ এ পি এ, এন আই এ প্রভৃতি দানবীয় আইনের মাধ্যমে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করা হচ্ছে। শ্রমজীবীদের আন্দোলন সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে নির্মাণ করা হয়েছে চারটি শ্রম কোড। প্রায় এক বছর ধরে চলা ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের চাপে তিনটি কৃষি আইন বাতিলের ঘোষণা করতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হলেও, ফসলের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ, গ্রেপ্তার হওয়া কৃষকদের মুক্তি প্রভৃতি বিষয় এখনও মানা হয়নি। নব্য উদারনীতির পরিণতিতে এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণের অতিমারিতে জাতীয় অর্থনীতি বিপন্ন। বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক। এর প্রভাবে বেকারি, দারিদ্র্য, অসাম্য, কর্মচ্যুতি এখন মারাত্মক ব্যাধির আকারে প্রকটিত। এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক মহামন্দা অতিক্রমে মানুষের হাতে অর্থ এবং খাদ্য পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি (আর এস এস পরিচালিত বি এম এস এবং তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত আই এন টি টি ইউ সি ব্যাতীত) এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষক কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলি দশ দফা দাবিতে আগামী ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ১৯৯১ সালে জাতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার বেসরকারীকরণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উদারীকরণের মধ্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে যে নব্য উদারবাদী নীতির প্রয়োগ শুরু করা হয়, তার পরবর্তী তিন দশকে এই নীতির সর্বনাশা পরিণতির বিরুদ্ধে ২০টি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ধর্মঘটটি হবে ২১তম ধর্মঘট। এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠার পর যতগুলি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের সরকার ধর্মঘটের বিরোধিতাই শুধু করেছে তা নয়, তাকে ভাঙার জন্য সবরকম প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আগামী সর্বভারতীয় ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের প্রকৃত শত্রু মিত্রকে চিনতে পারবে।

আসন্ন ধর্মঘটের দাবি সনদ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্দোলনগত প্রেক্ষিতগুলিও। সুতরাং অতীতের ২০টি ধর্মঘটের তুলনায় বেশ কিছু অতিরিক্ত গুরুত্ব এবং তাৎপর্য নিয়ে এবারের সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হবে।

এক

আসন্ন সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের দাবি সনদের তাৎপর্যগুলি আলোচনার পূর্বে ধর্মঘটের প্রেক্ষিতটিও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। বিগত তিন দশক ধরে চলে আসা নব্য উদার অর্থনীতির পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিগত দু'বছর ধরে চলা কোভিড-১৯ অতিমারি সংক্রমণ। নরেন্দ্র মোদি সরকার প্রথম দফায় ডিমনিটাইজেশন বা নোটবন্দীর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে পাঁচশো ও এক হাজার টাকার নোট বাতিল করে সমগ্র অর্থনীতিকে এক চূড়ান্ত বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়। এর ফলে বিপন্ন হয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। এরপরই অপরিকল্পিতভাবে চালু করা হয়েছিল জি এস টি। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে কোভিড-১৯ অতিমারি এবং তদ্‌জনিত কারণে দীর্ঘস্থায়ী লকডাউন জাতীয় অর্থনীতি এবং জনগণের জীবন-জীবিকাকে বিপন্ন করে। অর্থনীতিতে যে মন্দাবস্থা চলছিল, তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (আই এম এফ) প্রকাশিত জানুয়ারি ২০২১-এ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউট লুক থেকে জানা যায় যে, ২০১৯ সালে ভারতের জাতীয় আয় ৪.২৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কয়েক বছর পূর্বে এই বৃদ্ধির হার অনেক বেশি ছিল। আই এম এফ-এর মতে এরপর নোট বাতিল এবং বিশ্বব্যাপী মন্দার কারণে এই হার হ্রাস পেতে পেতে এখানে এসে দাঁড়ায়। ২০২০ সালে অতিমারি ও লকডাউন জাতীয় বৃদ্ধির হারকে এক ধাক্কায় ঋণাত্মক করে তোলে। আই এম এফ-এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ভারতের জাতীয় আয় ৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয় দফার কোভিডের আক্রমণের পর ২০২২-এর বৃদ্ধির হার সম্পর্কে আই এম এফ তার পূর্বাভাষ সংশোধিত করেছে। আই এম এফ-এর অক্টোবরে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুকের পূর্বাভাষে দেওয়া হয়েছে যে, ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২১ সালে জাতীয় আয় ১.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। আর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে ০.২৭ শতাংশ।

আই এম এফ-এর হিসেবের সম্ভাব্য কিছু পরিবর্তন হতে পারে। দেশ বিদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা সকলেই একমত যে, ২০২১ সালে ভারতের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে ব্যর্থ হবে। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২১ সালে মাথাপিছু আয় কমে যাওয়া। এই চিত্রের বিপরীতে রয়েছে নিদারুণ বৈষম্যের চিত্র। বিশ্বব্যাঙ্ক তাদের ইনইকোয়ালিটি রিপোর্টে ২০২১ সালে ভারতের ক্রমবর্ধমান অসাম্যের চিত্র তুলে ধরেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৮০ সালে ভারতের এক শতাংশ ধনীদের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশ। ২০২১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে জাতীয় আয়ের ৫৭ শতাংশ। একই সময়ে দরিদ্রতম ৫০ শতাংশের আয় জাতীয় আয়ের ২১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেতে পেতে ১৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এর মানে সব থেকে ধনী ১ শতাংশের সম্পদ আরও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের সম্পদের পরিমাণ জাতীয় আয়ের প্রায় ২২ শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০২১ সালে ভারতের দরিদ্রতর ৫০ শতাংশের মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয় ৫০ হাজার টাকা, উপরের দিকে ১০ শতাংশের বাৎসরিক গড় আয় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা এবং ঊর্ধ্বতম ১ শতাংশের আয় ৪৪ লক্ষ টাকার বেশি।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের পূর্বোক্ত রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, ভারতে অসাম্য সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব প্রকাশ করা হয় না। অর্থাৎ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে অসাম্যের প্রকৃত তথ্য গোপন করে। সরকারের উপলব্ধি করা প্রয়োজন অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থা পিউ রিসার্চ তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, কোভিড অতিমারির প্রকোপে ৩ কোটি ২০ লক্ষ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের পর্যায়ে নেমে এসেছে। বস্তুত পক্ষে অতিমারির ফলে বিশ্বব্যাপী যত মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে নিম্নবিত্তে নেমে এসেছে, তাদের অধিকাংশই ভারতীয়।

অসাম্য বৃদ্ধির অপর একটি কারণ হল, মূল্যবৃদ্ধি। ভারতে মূল্যসূচক নির্ধারণ করার সময় অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর তুলনায় খাদ্য সামগ্রীর ওপর জোর দেওয়া হয়। এর কারণ হল দেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। ফলে মোট ব্যায়ের সিংহভাগ খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতে হয়। তাই মূল্যবৃদ্ধির অর্থ হল খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হলে ধনীদের কিছু এসে যায় না, কিন্তু গরিবরা সঙ্কটে পড়ে। ২০২০ সালের নভেম্বর মাসের তুলনায় ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে পাইকারি জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ১৪.২৩ শতাংশ। আনাজ এবং জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধির কারণেই এটি ঘটেছে।

অসাম্যের পাশাপাশি দারিদ্রও ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নীতিআয়োগের পক্ষ থেকে নতুন দারিদ্র্য সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। এর শিরোনাম হল 'মাল্টিডাইমেনশনাল পোভার্টি ইনডেক্স' (এম পি আই)। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সালে ভারতের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ২৫.০১ শতাংশ। তেন্ডুলকর কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এই হার ২০১১-১২ সালে ছিল ২১.৯৭ শতাংশ এবং সি রঙ্গরাজন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এই হার ছিল ২৯.৫ শতাংশ। এস বি আই-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে গ্রামীণ স্তরে দারিদ্র্যের হার হল ৩২.৭৫ শতাংশ যা শহরের দারিদ্রের হারের (৮.৮১ শতাংশ) তুলনায় চার গুণ বেশি। জাতীয় স্তরের ১২টি প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে এই সূচক সংখ্যা নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পুষ্টি (২৮.১৪ শতাংশ), বিদ্যালয়ে প্রবেশ (১৫.১৪), প্রসূতি স্বাস্থ্য (১০.০৪), জ্বালানীর মূল্য (৯.০৪), ময়লা জল নিষ্কাশন (৮.৬১), আবাসন (৮.৩১), বিদ্যালয়ে উপস্থিতি (৭.৩৯), সম্পদ (৩.৫৮), বিদ্যুৎ (৩.৩৫), পানীয় জল (২.২৫), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট (২.১৭) এবং শিশু-কিশোর মৃত্যু (১.৩৫) শতাংশ।

সর্বভারতীয় চিত্রে দেখা যায় যে, গ্রামীণ জনগণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩২.৭৫ শতাংশ) এবং শহরের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারীদের সংখ্যার হারে গ্রাম শহরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আবার সামগ্রিক দারিদ্রের হারে একটি রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, কেরালায় সর্বনিম্ন স্তরে ২০১৫-১৬ সালে দারিদ্রের হার ছিল ০.৭১ শতাংশ, বিহারে এই হার ৫.৯১ শতাংশ।

ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম নেতিবাচক বিষয়টি হল ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা। ২০২০ সালে ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ছিল ৯৪ তম। ২০২১ সালে এই অবস্থনের অবনতি ঘটেছে। এই সময় ১১৬টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১০১ তম। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের এই অবনমন প্রমাণ করছে যে ভারতের ক্ষুধা ও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই সূচক তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং নেপালের অবস্থা আরও খারাপ। নব্য উদারনীতির প্রয়োগের ফলে পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। রান্নার গ্যাসের দাম ঊর্ধ্বমুখী। ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে রান্নার গ্যাসের দাবি সিলিন্ডার প্রতি ৩০০ টাকার অধিক বৃদ্ধি পেয়ে ৬০৪ টাকা থেকে ৯০৬ টাকায় পৌঁছে গেছে। একই সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে পেট্রোল, ডিজেলের দাম। বিগত এক বছরের পেট্রোল, ডিজেলের মূল্য গড়ে যথাক্রমে ২৬ শতাংশ এবং ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৭৯ শতাংশ এবং ১০১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও, ভারতে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক আরোপিত বিপুল কর। পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির পরিণতিতে পণ্য পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২০-২১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ডিজেল ও পেট্রোলের উপর এক্সাইজ ডিউটি বসিয়ে ৩.৭৩ লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

দারিদ্রের পাশাপাশি বেকারি আর একটি গুরুতর সমস্যা। সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সি এম আই ই) দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, অতিমারির সময় দু'কোটির বেশি মানুষ চাকরিচ্যুত হয়েছেন। এর বেশির ভাগ অংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে। বিশেষত নির্মাণ শিল্প, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, পরিবহন, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্র সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রথম পর্বের লকডাউনে প্রায় ১৪ কোটি মানুষ জীবিকাচ্যুত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃক আরোপিত লকডাউনের দ্বিতীয় পর্বে (এপ্রিল-মে, ২০২১) ২৩ কোটি মানুষ ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। এদের একটা বড় অংশ কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই অংশের শ্রমিক কর্মচারীদের কাজের বোঝাও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পপতিদের সংস্থা 'ফিকি'র মতে ৫৮ শতাংশ শিল্প সংস্থা জানিয়েছে যে ৩৮ শতাংশ ব্যবসায়িক সংস্থা জানিয়েছে যে লকডাউনের প্রভাবে তাদের সংস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এবং ৩৮ শতাংশ মনে করে সংস্থায় এর প্রতিক্রিয়া বেশ বড় ধরনের, ৭১ শতাংশ ব্যবসায়িক সংস্থা জানিয়েছে যে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে তাদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে।

অতিমারির সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকার এবং তাদের শরিক বা সমমতাবলম্বী রাজ্যসরকারগুলি শ্রমজীবী জনগণের ওপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। দেশে প্রচলিত ৪৪টি শ্রম আইনকে বাতিল করে চারটি শ্রমকোড তৈরি করেছে। এইসব শ্রমকোডের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, দরকষাকষি এবং ধর্মঘটের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। অর্থাৎ অতিমারির সুযোগ নিয়ে একদিকে শ্রমিক কর্মচারীদের কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য করা হবে এবং কাজের বোঝা বাড়ানো হবে। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন সুযোগ হরণ করে নেওয়া হবে।

বিজেপি জোট সরকার ডিসেস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট প্রয়োগ করে লকআউট, ছাঁটাই প্রভৃতির ন্যায় কালাকানুন শ্রমিকশ্রেণির ওপর প্রয়োগ করে চলেছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের বাক্ স্বাধীনতা ও প্রতিবাদকে রুখে দেওয়া হচ্ছে। ইউ এ পি এ, আই এন এ-র ন্যায় আইনগুলিকে প্রতিবাদী শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশের

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

ভারতের আয় বৈষম্যের কারণ

তথ্য নিয়ে, বিংশ শতাব্দী জুড়ে ধর্মের প্রভাব সংক্রান্ত অনুসন্ধান করে, একটি ভ্রান্ত ধারণার অসারতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, আর্থিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হল ধর্মনিরপেক্ষতা। গবেষণায় আরও স্পষ্ট হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা সুনিশ্চিত করলে, আর্থিক উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এটা একমাত্র তখনই সম্ভব যদি বৈচিত্র ও সহনশীলতার প্রতি ধৈর্যশীল হওয়ার পাশাপাশি একটা সমাজ জাত, ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সব মানুষকে সমমর্যাদা প্রদান করে। ধর্মনিরপেক্ষতার কেন্দ্রীয় বিষয় হল সমাজ জীবন থেকে ধর্মকে বিযুক্ত করা। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বাস নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি মর্যাদা প্রদান এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রতি আস্থা গড়ে ওঠে। ইউরোপ এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশ যেমন, চীন, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতির কয়েক শতকের অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়—পুরোনো সামাজিক কাঠামোর পুণর্গঠন নয়, একে ভাঙতে হবে।

একমাত্রিক দেশ একটি ভ্রান্ত ধারণা

একটি ধর্ম ও একটি ভাষার সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত নীতির ফলে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীত দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার গুরুতর অর্থনৈতিক পরিণাম রয়েছে এবং আয় অসাম্য এর প্রমাণ। 'একমাত্রিক দেশ' গড়ার তৎপরতা বহু বৈচিত্র্যের সাথে খাপ খায় না। সমস্ত নাগরিকের জীবনের জন্য, এমনকি তা অনাড়ম্বর হলেও, যে সুযোগগুলি রয়েছে, তা গভীরভাবে সমাজজীবনে গ্রন্থিত হয়ে আছে। সরকারের নতুন অগ্রাধিকার ও নীতিসমূহ এই গ্রন্থিগুলিকে ছিঁড়ে দিচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, পুরোনো বৈশিষ্ট্যগুলি, যার মধ্যে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যগুলি বিনা উপদ্রবে বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে, সেগুলিকে ভেঙে না ফেলে, রাষ্ট্র এমন পদ্ধতি ও নীতি অনুসরণ করছে, যা ঐ বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও শক্তিশালী করছে। এর ফলে আধুনিক ভারতের ভিত্তিটাই মূলগতভাবে বিকৃত হয়ে পড়ছে।

বৈচিত্রপূর্ণ, মিশ্র ও সর্বজনীন ধারণা সমূহকে অসত্য বলে দেগে দিয়ে, ধর্ম ও পছন্দের স্বাধীনতা, যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে ভারত, তাকে অপরাধ সাব্যস্ত করার হীন উদ্দেশ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণাম রয়েছে। ঠিক একই কথা বলে সতর্ক করেছিলেন বি আর আম্বেদকর, "রাজনীতিতে এক ব্যক্তি, এক ভোট এবং এক মান আমরা মেনে নেব। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে, আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দোহাই দিয়ে এক ব্যক্তি, এক মান মেনে নেব না। জীবনের এই দ্বন্দ্ব নিয়ে আমরা কতদূর এগোতের পারব? কতদিন আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সমতাকে অস্বীকার করে চলব?"

১৯৪৯ সালে বি আর আম্বেদকর যে নির্মম সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন, তা হল, আমরা যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যকে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখি, তাহলে তা একদিন রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ধাঁচটিকেই উড়িয়ে দেবে। আমরা আরও বেশি ঝুঁকি নিচ্ছি। দেশের ভবিতব্য নিয়ে কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। পছন্দ বাছাই করতে হয়, ভবিতব্য গড়ে তুলতে হয়। আধুনিকতার ধারণার মোড় ঘুড়িয়ে দিয়ে, জনজীবনে ধর্মের মাত্রাতিরিক্ত অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, ভারত যে আধুনিকতার আদর্শকে গ্রহণ করেছিল তাকে পরিত্যাগ করে আমরা সম্ভবত ইতোমধ্যেই এমন এক সঙ্কীর্ণ পথে ঢুকে পড়েছি, যা শেষ হয় এমন একটা জায়গায় যেখানে বহু দেশ এবং আমাদের বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী আগেই পৌঁছে গেছে, শুধুমাত্র ধ্বংস ও হতাশার গর্ভে। □

[সৌজন্যে ঃ দ্য হিন্দু, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২১
অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য]

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

২৩ ও ২৪ সাধারণ ধর্মঘট

স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যেমন নির্বাচন কমিশন, ইডি, মানবাধিকার কমিশন প্রভৃতির ন্যায় ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে। আর এস এস পরিচালিত বিজেপি ও তাদের পরিচালিত বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিজেপির শরিক রাজ্যসরকারগুলিও গৈরিকীকরণের কাজ বা জাতীয় শিক্ষানীতি সেই লক্ষ্যে নির্ধারণ করছে।

আর এস এস ও বিজেপি এখন 'নয়া ভারত ঐতিহ্য'-র ধারণা নির্মাণ করছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস নয়। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট অর্থাৎ যেদিন দেশের সংবিধানের ৩৭০ ধারা ও কাশ্মীরের জন্য ৩৫(ক) ধারা বাতিল হয়, সেদিনটিই হল প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস। এটিই হল হিন্দুত্ববাদী ভাষ্য।

একই সাথে ২০২০ সালের ৫ আগস্ট অর্থাৎ যেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামমন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন, সেদিনটিকেও ভারতের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন বলে ব্যাখ্যা হচ্ছে।

কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকার অতিমারির সুযোগ নিয়ে প্রতিরক্ষা শিল্প ও বিমা ব্যবসায়ে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করছে। সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্র বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। অর্থাৎ আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ইলেকটোরল অটোক্রেসির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—বর্তমানে এই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই ইউ এ পি এ, এন আই এ প্রভৃতির আইনের অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে।

আসন্ন দু'দিন ব্যাপী সর্বভারতীয় ধর্মঘট দেশের এই আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

দুই

আসন্ন দু'দিন ব্যাপী সর্বভারতীয় ধর্মঘটের দাবি সনদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দাবি সনদে শ্রমিকশ্রেণির দাবির পাশাপাশি যুক্ত করা হয়েছে কৃষক সমাজের দাবিকেও। দাবি সনদে বলা হয়েছে তিনটি কৃষি আইন বাতিল সহ অন্যান্য বিষয় যেমন, বিদ্যুৎ বিল বাতিল, আন্দোলনরত কৃষকদের নিঃশর্ত মুক্তি, কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি পাঁচ দফা দাবি মানতে হবে। এর মধ্য দিয়ে শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর ধারণাকে পরিপুষ্ট করা হয়েছে। একই সাথে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন দাবি যেমন স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা, ন্যূনতম বেতন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে সমাজের অবহেলিত অংশের স্বার্থরক্ষায় শ্রমিকশ্রেণি নিজেকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আসন্ন ধর্মঘটের দাবিসনদে জাতীয় অর্থনীতির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ যেমন, আয়কর দাতা নয় এমন পরিবারকে মাসে ৭৫০০ টাকা অর্থ সাহায্য, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ বন্ধ, মানুষের হাতে নগদ হস্তান্তর ও বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থা, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতির মন্দাবস্থা অতিক্রমে চাহিদার সৃষ্টি বা বৃদ্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয়। সরকারী উদ্যোগ ব্যতীত অর্থনীতিতে চাহিদা সৃষ্টি সম্ভব নয়। রেগা প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি বা শহরে এই ধরনের প্রকল্প চালু করার মধ্য দিয়ে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব, যা সৃষ্টি করবে বর্ধিত চাহিদা। একই সাথে এন এম পি সহ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার বেসরকারীকরণ বন্ধ করার প্রসঙ্গটি শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, রাজনৈতিক কারণে বিশেষত দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার সাথে যুক্ত।

রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাকে ভিত্তি করে বিপুল পরিমাণ জাতীয় সম্পদ গড়ে উঠেছে। যেখানে শ্রমিক কর্মচারীদের বিপুল অবদান রয়েছে। এই অমূল্য জাতীয় সম্পদ জলের দরে দেশি-বিদেশী লুটেরাদের হাতে তুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এন এম পি হল সর্বশেষ উদাহরণ। ভারতে বর্তমানে ২৯৮টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা রয়েছে। এর মধ্যে ৬৩টি সংস্থা এখনও উৎপাদন শুরু করেনি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এদের পেইড আপ ক্যাপিটালের পরিমাণ ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকা। এইসব সংস্থার অধিকাংশই প্রতিবছর মুনাফা করার মধ্য দিয়ে বিপুল অঙ্কের অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দেয়। ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০১৮-১৯ সাল অর্থাৎ এই ২২ বছরে এইসব সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে সরকার পেয়েছে ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা।

এছাড়া দেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেল, কয়লা, ইস্পাত, প্রাকৃতিক গ্যাস, পরিবহন ব্যবস্থা, ভারি শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার হাত ধরে আমাদের দেশ স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব। আর এই অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যা আবার দেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। রাষ্ট্রায়ত্ব সম্পদের বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে তাই শুধু জাতীয় সম্পদ লুটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাই নয়, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি জাতীয় মূল স্তম্ভগুলি আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এই কারণে আসন্ন ধর্মঘট হল একই দিকে জনসাধারণকে রক্ষা করার সংগ্রাম, অপরদিকে দেশ রক্ষার সংগ্রামও বটে। এই কারণে আগের ২০টি সর্বভারতীয় ধর্মঘটের তুলনায় এই ধর্মঘটের কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

বর্তমান বছরটিতে ১৯৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি ধর্মঘটের ৪০ বছর পূর্তি। ঐদিন স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সব থেকে জঙ্গী সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল। যেদিন শহর এবং গ্রামের শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে একদিনের ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। এটি ছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। যদিও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং জাতীয় ফেডারেশন সমূহের স্পন্সরিং কমিটি এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, কিন্তু দাবি সনদে কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে আইন তৈরি এবং কৃষকদের জন্য ফসলের লাভজনক দামের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৮২ সালে ১৯ জানুয়ারির ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করে বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড বি টি রণদিভে লিখেছিলেন, "ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণির দাবিগুলিকে কৃষক এবং কৃষিশ্রমিকের চাহিদার সাথে একত্রিত করে বুর্জোয়া জমিদার শাসনের অধীনস্থ দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাত্রার সম্মুখীন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।" তিনি আরও বলেছিলেন, "এই চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নের এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

আসন্ন ধর্মঘটের আন্দোলনগত প্রেক্ষিতে দেশের ব্যাঙ্ক শিল্পের আধিকারিক ও কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট ১৬-১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ধর্মঘট ব্যাপকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি বিদ্যুৎ শিল্পে সর্বভারতীয় ধর্মঘট আহূত হয়েছে। এইসব ধর্মঘট আসন্ন সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের সাফল্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আগামী ২১তম সর্বভারতীয় ধর্মঘট সফল করার মধ্য দিয়ে দেশের শ্রমিক শ্রেণি এক নয়া ইতিহাস রচনা করবে। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

বাম পথে চিলি

পরাজিত চরম দক্ষিণপন্থী প্রার্থী কাস্ট-এর নির্বাচনী এজেন্ডাতে সরাসরি নয়া উদারনীতি এবং পিনোচেত জমানার রাজনীতির প্রতি সমর্থন ছিল। বরিকের এজেন্ডা ছিল ধনীদের আয়ের উপর কর বৃদ্ধি করা, পুরানো সরকারী পেনশন ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন, সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা করা, সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা ইত্যাদি। এছাড়া খনিগুলির বিশেষত কপার ও লিথিয়ামের খনিগুলির রাষ্ট্রীয়করণের ঘোষণাও ছিল।

বরিকের জয় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, এটা জনগণের লাগাতার সংগ্রামের ফসল এবং সংগ্রামের রাস্তায় থাকা মানুষের প্রত্যাশার ফসল। চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল চরম দক্ষিণপন্থার পরাজয়কে সূচিত করছে এবং অবশ্যই নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত করছে। □

স্মরণসভা ও রক্তদান কর্মসূচী

ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড শ্যামচাঁদ মনিগ্রাম ২১ জুলাই ২০২১ প্রয়াত হন। তাঁর স্মরণে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে গত ২০ আগস্ট ২০২১ তারিখে ৫০ জন সদস্য কর্মচারীর উপস্থিতিতে প্রিয় সমিতি এক স্মরণ সভার আয়োজন করে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশিষ ভট্টাচার্য, তাঁর স্ত্রী মালা মনিগ্রাম, কন্যা এবং আরও অনেকে তাঁর স্মৃতিচারণা করেন। কমরেড শ্যামচাঁদ মনিগ্রামের স্মরণে সমিতি ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে ৪৪তম রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালন করল। উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা ও সহ সভাপতি গীতা দে। ২৯ জন কর্মচারী ও সদস্য এই কর্মসূচীতে রক্তদান করেন। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি ও ভারতীয় অর্থনীতি

টাকার দাম স্থিতিশীল হয় এবং অর্থনীতিতে সর্বমোট চাহিদা হ্রাস করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভারতীয় কর্তা ব্যক্তিদের সুদের হার বৃদ্ধি করতে হবে, যা নয়া উদারবাদের বৃত্তে প্রধান নীতিগত পদক্ষেপ। কিন্তু এর ফলে অতিমারি জনিত অর্থনৈতিক মন্দা থেকে বেড়িয়ে আসার কাজটা আরও কঠিন হবে। আসলে নয়া উদারবাদে, সরকার চাক বা না চাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদের হার বৃদ্ধি করলে, এদেশেও সুদের হার বৃদ্ধি করা ছাড়া উপায় নেই। সুদের হার বৃদ্ধি না করলে, পুঁজির বহির্গমন থামবে না, টাকার দাম হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে এবং সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতির সঙ্কট ঘনীভূত হবে। তাই ভারতীয় অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং ঘুরে দাঁড়ানোর সগর্ব ঘোষণা ভিত্তিহীন দুটি কারণে—

প্রথমত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে মানুষের অবদমিত ভোগব্যয় এবং দ্বিতীয়ত, মার্কিন মুদ্রাস্ফীতিজনিত অর্থনীতির ওপর বাহ্যিক চাপ যা আমাদের সরকারকে আবারও নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ও আর্থিক পদক্ষেপ গ্রহণ বাধ্য করবে।

এই সমস্ত ঘটনাবলী নয়া উদারবাদী বিশ্বায়িত ব্যবস্থার কার্যাবলীর পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে। প্রাক্ নয়া উদারবাদী ব্যবস্থায়, মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেলে, তার সামান্য প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে পড়ত। এবং এই পরিকল্পিত মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রভাব পড়তে পারত, তা হল ভারতীয় পণ্যের জন্য মার্কিন বাজারকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত না করে রপ্তানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কিন্তু রপ্তানির ওপর এই নেতিবাচক প্রভাবের ফলে আমদানি-রপ্তানির ফারাকজনিত সমস্যাকে আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সামলে নেওয়া যেত। এর ফলে রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে আমদানিও হ্রাস পেত। রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার ফলে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে অবনমন ঘটত, আমদানি হ্রাস করার মাধ্যমে তার সবটা পূরণ করা সম্ভব না হলেও, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া যেত।

প্রাক উদারবাদী পর্বে প্রতিটি অর্থনীতিই, অন্যভাবে বললে বলা যায়, স্বকীয় সত্তাবিশিষ্ট ছিল। ফলে একটি সত্তার ওপর অপর কোনো সত্তার বর্ধিত মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবকে, ঐ মুদ্রাস্ফীতিকে নিজের দিকে টেনে না নিয়ে এসেই মোকাবিলা করা সম্ভব হত। এমনকি সম্ভাব্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবনমনের সমস্যাও নিজের জমিতেই মেটানো যেত। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন নীতিপ্রকরণের প্রান্তিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বর্ধিত মুদ্রাস্ফীতি ও তদ্দজনিত মন্দার প্রভাবকে মোকাবিলা করা সম্ভব হত।

কিন্তু নয়া উদারবাদী জমানায় পুঁজি এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাতায়াত করে এবং পণ্য ও পরিষেবার আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণকে ভালো চোখে দেখা হয় না। সুতরাং একটা দেশ তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে একটা মাত্রায় বেঁধে রাখতে গিয়ে, তার আপেক্ষিক স্বকীয়তা ও স্বনির্ভরতাকে হারায়। বস্তুত, যে কোনো উন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে কোনো সমস্যা তৈরি হলে, তার গুরুতর প্রভাব পড়ে ভারতীয় অর্থনীতি সহ সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিতে। এই প্রভাবের স্বতঃস্ফূর্ত স্বরূপ হল, সরকার পছন্দ করুক বা না করুক, কিছু নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণে তাকে বাধ্য করা।

কখনও কখনও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই চাপ সৃষ্টি করা হয়। এক দেশ থেকে আর এক দেশে পুঁজির (এবং পণ্য ও পরিষেবার) চলাচলের স্বাধীনতা সহজেই মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার সমস্যাকে এক দেশ থেকে আর এক দেশে সহজেই এবং দ্রুতগতিতে টেনে নিয়ে যায়। তাই ভারতের মতো দেশে কর্মসংস্থানের সঙ্কট তৈরি হয়, শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ কারণেই নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের ঘটনাবলীর প্রভাবও এর একটা কারণ। নয়া উদারবাদের একনিষ্ঠ সেবক মোদি সরকার তাই আগামী দিনে ভারতীয় জনগণের জন্য আরও বেশি অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণ হবে। □

দ্বিতীয় রাজ্য মহিলা কনভেনশনের আহ্বান

গত ২৭ ও ২৮ নভেম্বর ২০২১ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সমাপ্ত হয়েছে দ্বিতীয় রাজ্য মহিলা কনভেনশন কর্মচারীভবনে। এক কথায় বলা চলে এটি একটি সফল ও সার্থক কনভেনশন। কনভেনশনে গৃহীত দাবিসনদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুখ্যসচিবের কাছে পত্র মারফৎ পাঠানো হয়েছে।

গীতা দে

তিন বছর আগে (৮, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮) অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম রাজ্য মহিলা কনভেনশন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ইতিহাসে এক অভিনব উদ্যোগ বিপুল উৎসাহ তৈরি করেছিল মহিলা কর্মচারীদের মধ্যে। কনভেনশনে ১১ দফা দাবিসমূহ গৃহীত হয়। কিন্তু কার্যকরী করার জন্য বর্তমান সরকারের কাছে প্রেরণা করা হলেও কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

করোনা অতিমারির প্রবল ধাক্কায় পর্যুদস্ত ২০ মাসের নিদারুণ অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আবার সকলের মুখোমুখি হতে পারলাম। অতিমারির কারণে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা সকলেই রয়েছি। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং জীবিকার ওপর এই পরিস্থিতির বহুমাত্রিক প্রভাব প্রতিনিয়ত অনুভূত হচ্ছে। কোভিড সংক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য শারীরিক দূরত্ব বিধি মেনে চলা, মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহার করার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সত্যি জরুরি।

বার বার মনে পড়ছে বিগত বছরের ভয়ঙ্কর সেই দিনগুলোর কথা, যখন একদিকে মারণ ভাইরাস আর অন্যদিকে পরিকাঠামোহীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আর তার পাশাপাশি স্বাস্থ্য প্রশাসক ও রাজ্য সরকারের তুঘলকী নির্দেশ, এই ত্রিফলা বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে সারা রাজ্যে মহিলারা বিশেষ করে নার্সিং কর্মচারীরা, আশা কর্মীরা কোভিড ওয়ার্ডে বা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ও বহির্বিভাগের দূরপ্রান্ত পর্যন্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাহীন এমনকি পরিবহনহীন অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নীরবে সরকারী দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন।

এক কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই দ্বিতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হলো গত ২৭-২৮ নভেম্বর কর্মচারী ভবনে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পরিস্থিতিকে ভেদ করে কনভেনশনের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখা।

এই কনভেনশনে জাতীয় এবং রাজ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বর্তমান জাতীয় এবং রাজ্য শাসকদলের গৃহীত নীতিগুলির বিষয়ে, যেগুলি শুধুমাত্র কর্মচারী স্বার্থবিরোধী নয়, শ্রমজীবী মানুষেরও স্বার্থবিরোধী, তাও এসেছে আলোচনায়।

আলোচনা হয়েছে শাসক শ্রেণীর মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দুত্ববাদ, পরিচিতি সত্তার রাজনীতির স্বৈরাচারী কার্যকলাপ নিয়েও।

আলোচনা হয়েছে রাজ্য প্রশাসনে সৃষ্ট সন্ত্রাস দমন-পীড়ন ও নজিরবিহীন অবহেলা নিয়েও। আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মায়েরা-মেয়েরা যে আত্মত্যাগ করেছিলেন, যে লড়াই চালিয়েছিলেন অহিংস আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের অংশ হিসাবে, তারই ফলশ্রুতিতে দেশের স্বাধীনতার পর আমাদের সংবিধানে নারীর সমানাধিকার লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

আমাদের রাজ্যে 'কন্যাশ্রী'র জন্য মুখ্যমন্ত্রী আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকার বিনিময়ে আবারও ভূষিত হবেন সেইসমস্ত বিভিন্ন মিডিয়ার প্রচারে আমরা শ্রমজীবী মেয়েরা তার সাথে তাল মেলাতে পারছি না। কারণ একই সাথে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম প্রকাশ করছে নারীপাচার, শিশু পাচার, যৌন হেনস্থা ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে।

কোথাও এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, যার থেকে মেয়েদের খাদ্য, কাজ ও সম্মানের সুরাহা সুনিশ্চিত হতে পারে। করোনার সংক্রমণে কমবয়সী মানুষ থেকে শিশুরা পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা ঘরে ফিরতে গিয়ে রাস্তাতেই প্রাণ হারালেন। বেঁচে থাকার মতো সরকারী কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

মহিলাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। অর্ধাহারে দিন কাটছে। বস্তিবাসী মহিলাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। সহসহায়িকা, নানা কাজে যুক্ত, এককভাবে থাকা মহিলারা অত্যন্ত অসহায়ভাবে রয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এই সময়ে গ্রাম বাংলায় মা ও শিশুদের পুষ্টি দ্রুত কমে যাচ্ছে, ফলে শিশু মৃত্যুও বাড়ছে। বেহাল জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থ। গর্ভবতী মায়েরা চরম হয়রানির শিকার। দেশে অপুষ্টিতে ভুগছে অন্তত ৩৩ লক্ষ শিশু।

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা স্কুলে গিয়ে মিড্-ডে মিলের খাবার খেত, এখন তাও কোভিডের কারণে বন্ধ থেকেছে স্কুল-অঙ্গনওয়ারির কেন্দ্রগুলি।

দেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যে করোনা মায়ের পুজো করার নামে নারীদের অবমাননা করা হচ্ছে। বুজরুকি আর অপবিজ্ঞানে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছে।

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। অনলাইনে পড়াশোনার অন্তরালে রয়েছে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

কর্মরতা মহিলা ঘরবন্দী, গৃহ সহায়িকা থেকে ছোটো ছোটো কাজে যুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকরা ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরাও যথাযথ সুরক্ষার অভাবে মারা যাচ্ছে। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন।

কাজ হারিয়ে বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত হয়ে মহিলারা সংসার বাঁচানোর তাগিদে ব্যস্ত। বাড়ছে গার্হস্থ হিংসা, যৌন নির্যাতন।

সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে আবারও তৃণমূল সরকারের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী দিনে ভয়াবহ বিপদ ডেকে এনেছে, বিশ্ব পুঁজিবাদী সঙ্কটের ফলে সারা দুনিয়াজুড়েই দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী কোভিড অতিমারির সুযোগ নিয়ে দক্ষিণপন্থী শক্তি নিজেদের আরও শক্তিশালী ও সংহত করেছে। ভারতে উগ্রসাম্প্রদায়িকতা ও মেরুকরণ বাড়ছে যার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তি ক্রমাগত দুর্বল হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতি খুবই কঠিন। কোভিড পরিস্থিতিতে সকল সাধরণ মানুষের জন্য ভ্যাকসিন দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। বিগত কয়েক বছর ধরেই শ্রমজীবী মেহনতী গরিব জনগণের সাথে কর্মচারী সমাজ ও ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরা আজ দারুণভাবে আক্রান্ত। সব থেকে বেশি আক্রান্ত মহিলা কর্মচারীরা।

সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা সমাজ। বিগত সময়ে মহিলাদের যেভাবে সামাজিক সুরক্ষা মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছিল আজ তা ভুলুণ্ঠিত। হরণ করার অপচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর শ্লীলতাহীন ও ধর্ষণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

রাজ্যের সর্বত্রই সংগঠনের কর্মী ও সদস্যরাও আতঙ্কের মধ্যেই আছে। সেই আতঙ্ক-হতাশা কাটিয়ে লড়াই আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে আমাদের অর্জিত অধিকার রক্ষা, দাবি-দাওয়া আদায় করা সহ সংগঠনকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করার লক্ষ্যই ছিল দ্বিতীয় মহিলা কনভেনশন মঞ্চে। আগামী বছর বহু অজানা আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজ করতে হবে আমাদের।

কনভেনশন শুধুমাত্র একটি মিলন উৎসব নয়, চিন্তার ঐক্য, ইচ্ছার ঐক্য এবং কাজের ঐক্যর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার একটা মন্ত্রও বটে। □

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার ৫১তম রাজ্য সম্মেলন

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার ৫১তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বিগত ২৮-২৯ আগস্ট, ২০২১ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত শহরের (কমরেড নির্মল পালিত নামাঙ্কিত নগর), রবীন্দ্র ভবন-এ (কমরেড কমল দত্ত নামাঙ্কিত মঞ্চে)। সম্মেলনের প্রাক্কালে ২৭ আগস্ট সন্ধ্যায় প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রবীর মুখার্জী। পরবর্তীতে তিনি পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। আলোচনা পরবর্তীতে প্রিয় সমিতির মুখপত্র ''আন্দোলনের অরুণিম''-এর বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন প্রবীর মুখার্জী। ২৮ আগস্ট রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক শোকপ্রস্তাব উত্থাপন ও সম্মেলনস্থলে উপস্থিত সকলের নীরবতা পালনের পরবর্তীতে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন ৫১তম রাজ্য সম্মেলনের সভাপতি মাননীয় সৌরভ চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। মহতী রাজ্য সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে পরিস্থিতি উপযোগী ইস্পাতদৃঢ় সংগঠন পরিচালনার লক্ষ্যে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য, আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ মানস দাস, খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সহ সম্পাদকদ্বয় শুভাশীষ চক্রবর্তী ও দেবকুমার দত্ত এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদ্বয় মনোজ সাহা ও কৃশাণু চ্যাটার্জী। সর্বভারতীয় দাবিসমূহ, রাজ্যস্তরের দাবি সমূহ এবং বিভাগীয় দাবি সমূহ উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য নজরুল ইসলাম। রাজ্য সম্মেলনে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রস্তাব পেশ করেন সমিতির অপর যুগ্ম সম্পাদক প্রশান্ত চন্দ। উপস্থিত ১৭টি জেলা প্রতিনিধিদের আলোচনার পরবর্তীতে সমস্ত আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল রায়। এছাড়াও সম্মেলন মঞ্চে বক্তব্য পেশ করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক খগেন নাগ, অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি পার্থপ্রতীম গোস্বামী ও ৫১তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী। রাজ্য সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে অমিতাভ সাহাকে সভাপতি, রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্যকে সাধারণ সম্পাদক, মানস দাসকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাতি করে ২৫ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও ৪৯ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। রাজ্য সম্মেলন পরিচালনা করেন অমিতাভ সাহা, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ও বিদেশ বেরাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলন মঞ্চে তিনদিন বিভিন্ন পর্বে গণসঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। □

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভা

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহীর সভা গত ১৩-১৪ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে তেলেঙ্গানা এন জি ও'স সেন্ট্রাল ইউনিয়নের উদ্যোগে হায়দ্রাবাদ শহরের তেলেঙ্গানা টুরিজম হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বহুমুখী আক্রমণ ব্যাখ্যা করে আগামী করণীয় সম্পর্কে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন।

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের গঠন পর্বে ১৯৬০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশেই কর্মচারীদের আর্থিক দাবি নিয়ে ধর্মঘটের মাধ্যমে পথ চলা শুরু। লড়াই সংগ্রামের দীর্ঘ ৬০ বছরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক ও অধিকারগত দাবি আদায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় সাধারণ সম্পাদক বলেন, কোভিড অতিমারি পরিস্থিতিতে মানুষ যখন কাজ হারাচ্ছেন, ক্রয় ক্ষমতা হারাচ্ছেন, তখন দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে আয়কর আওতার বাইরে থাকা দরিদ্র জনগণকে মাসিক ৭৫০০ টাকা নগদ অর্থ তুলে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেশি-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী কেন্দ্রীয় সরকার সেই ধরনের জনস্বার্থবাহী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এই সময়ে দ্রুতলয়ে বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করে চলেছে। কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারী স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিবর্তে বেসরকারী স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে মুনাফার সর্বোচ্চকরণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

ভ্যাকসিন গবেষণা, প্রস্তুত এবং সরবরাহের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, তাতে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বিনামূল্যে সকলের জন্য ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু সরকার দেশের সকল জনগণেরও জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থার পরিবর্তে বেসরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাকসিন ব্যবসার সুযোগ করে দেয়। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 'ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপ লাইনে'র নাম করে দেশের সমস্ত ধরনের সম্পদ বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের কৃষক সমাজ গত ২৬ নভেম্বর, ২০২০ থেকে লাগাতার এক বছর ধরে শুধুমাত্র ৩টি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাই না, বর্তমানে সেই লড়াই দেশ রক্ষার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এই সংগ্রাম শুধুমাত্র কৃষক-ক্ষেতমজুরদের সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রাম সকল দেশপ্রেমিক মানুষের, যারা দেশকে রক্ষা করতে চায়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আগামী বাজেট অধিবেশনের সময়ে জনস্বার্থ বিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে এবং দেশ রক্ষার স্বার্থে দুদিন ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে অবতীর্ণ হবে। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন এই ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নিজস্ব দাবি যেমন, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, শূন্যপদ পূরণ, বিধিবদ্ধ পেনশন ব্যবস্থা চালু, কোভিডে প্রয়াত কর্মচারীর পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি দাবিতে একইদিনে দেশব্যাপী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে দাবি কার্যকরী করতে বাধ্য করতে হবে।

ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করতে রাজ্যস্তরে কনভেনশনসহ সমস্ত প্রচার-প্রস্তুতি ডিসেম্বর, ২১ মাস থেকে শুরু করতে হবে।

● জাতীয় কার্যনির্বাহী সভার পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকারী পেনশনার্সদের নিয়ে সারা ভারত রাজ্য সরকারী পেনশনার্স ফেডারেশন গঠনের লক্ষ্যে গত ১৫ নভেম্বর, ২১ অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

● নয়া পেনশন সিস্টেম এবং চুক্তির কর্মচারীদের নিয়ে দু'দিনের ওয়ার্কশপ আগামী ১১-১২ ডিসেম্বর, ২১ বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে।

● সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় (সুকোমল সেন ভবন) নির্মাণের কাজ পূর্ণমাত্রায় চলছে। আগামী এপ্রিল '২২ মাসে ফরিদাবাদে উদ্বোধন করা হবে।

● জাতীয় সম্মেলন আগামী ১৬-১৮ এপ্রিল, '২২ বিহার রাজ্যের বেওস্তসরাইতে অনুষ্ঠিত হবে। কোভিড পরিস্থিতিতে সীমিত সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন হবে। ৫০ হাজার সদস্য পর্যন্ত ২৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিথ থাকতে পারবেন।

● আগামী জানুয়ারি, '২২ মাস থেকে এমপ্লয়িজ ফোরামের হিন্দি সংস্করণ প্রকাশিত হবে। গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা।

● সংগঠনের অগ্রগতির স্বার্থে ফেডারেশনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাজ্যের কেন্দ্রীয় স্তরের সংগঠনের সাথে বছরে একবার মিলিত হবেন।

● পরবর্তী জাতীয় কার্য নির্বাহী সভা আগামী মার্চ, '২২ মাসের প্রথম সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশের সানাতে অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় কার্যনির্বাহী সভায় ১৮টি রাজ্যের ১৯টি সংগঠন আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবনাকে সমর্থন জানান। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক তথা সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সহ সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ।

সভায় মহিলা অধিবেশনে ৭জন মহিলা প্রতিনিধি আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুতপা হাজরা আলোচনা করেন।

সমস্ত আলোচনা গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এ.শ্রীকুমার। সভা পরিচালনা করেন চেয়ারম্যান সুভাষ লাম্বা। □

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

Editor : SUMIT BHATTACHARYA | **State Co-ordination Committee** | **Regd. No. : 18484/71**
SANGRAMI HATIAR | 49th Year, 5th & 6th Edition, September-October 2021

দ্বিতীয় রাজ্য মহিলা কনভেনশন

বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, শূন্যপদ পূরণ সহ পাঁচ দফা দাবিতে আয়োজিত কেন্দ্রীয় মিছিলের (৭ ডিসেম্বর ২০২১) বিভিন্ন মুহূর্ত

৩১ অক্টোবর ২০২১, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভা। বিষয় ঃ কোভিড পরবর্তী পৃথিবী ও জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গ। আলোচক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অনুপ রায়।

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।